বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা সংখ্যা

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানু-মার্চ ২০০৯

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
[সংগ্রহ জাইদ-বিন-কালাম]

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৬ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

(সংগ্রহ করতে হবে)

শরমিন নিশাত
নির্বাহী সম্পাদক, হালখাতা

সম্পাদকীয়: দুই

(সংগ্রহ করতে হবে)

শওকত হোসেন
সম্পাদক, হালখাতা

সূচি

প্র ব ন্ধ

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মানব উন্নয়ন

আ বু ল বা র কা ত ০৫

সা ক্ষা ৎ কা র

দ্রব্যমূল্যর উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা

ব দ রু দ্দী ন উ ম র ২১

প্র ব ন্ধ

দ্রব্যমূল্য কমেনা কেন বাংলাদেশে–কেন মন্দা বিশ্বে

আ বী র হা সা ন ৩৩

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ও অভিঘাত: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

হা রা ধ ন গা ঙ্গু লী ৪১

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থার প্রতিকার

আ দি ত্য ন জ রু ল ৫১

বিশ্বমন্দা: বিশ্ব পুঁজিবাদের মহাসংকট

এ ম. এ ম আকাশ ৫৪

প্রকট বিশ্বমন্দা: তল খুঁজে ফেরা

আ তি উ র র হ মা ন ৭৩

দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় চাপ: মধ্যবিত্তের ভূত-ভবিষ্যৎ

ফ রী দু ল আ ল ম ৮২

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা: কার্যকারণ অনুসন্ধান

শা হ আ ল ম সা রো য়া র ৯৩

প্র ব ন্ধ

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মানব উন্নয়ন

আ বু ল বা র কা ত

প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে না

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে আমাদের দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবন পরিচালনে দুর্গতি বাড়ছেই। কেন এমন হয়? আর কেনই বা ক্রমবর্ধমান এ অসহায়ত্ব রোধ করা যাচ্ছে না? অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকিয় জ্ঞান বিষয়টিকে বিশ্লেষণে অপারগ। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ-সমীকরণে দুর্বৃত্তায়নের সব নির্দেশক যুক্ত করা প্রয়োজন। যার মধ্যে আছে কালো টাকা, লুটপাট, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অস্ত্র, পেশীশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, অর্থ ও সম্পদ পাচার, কুশাসন, নিপীড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার, নির্বাচনে বিনিয়োগ– সব কিছু। আসলে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতির প্রথাগত পাঠ্যপুস্তকিয় চাহিদা-সরবরাহের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অনেক চলকই কাজ করে। অনেকক্ষেত্রেই সেগুলো নির্ধারক চলক হিসাবেই কাজ করে। এখানে দ্রব্যমূল্যের কথাই ধরা যাক। প্রতি কিলোগ্রাম পেঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষক (উৎপাদক) পান মাত্র ২ টাকা, আমরা কিনি ২০ টাকায়, অথচ বাজার অর্থনীতির সব হিসেব ঠিক মত চললে আমাদের কেনার কথা প্রতি কেজি ৭-৮ টাকা। আর উৎপাদক কৃষকও পেতে পারেন এখনকার তুলনায় তিনগুণ বেশি। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থাটা এক ধরনের মূল্য সন্ত্রাসের পর্যায়েই পড়ে। কেজি প্রতি মাঝখানের ১৩-১৫ টাকার চাঁদাবাজি সম্ভবত পরিকল্পিত সিন্ডিকেট ভিত্তিক সন্ত্রাসু এসব বিষয় প্রথাগত অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিশ্লেষণ করবে? ভ্যালু-চেইনে কৃষক আর ভোক্তার এ দুর্দশা প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিশ্লেষণ করবো? চাহিদা-সরবরাহ বিশ্লেষণের সমীকরণে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, কুশাসন (রাজনৈতিক-অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট) চলক উহ্য রেখে কোনো দিনই উদঘাটিত হবে না প্রকৃত সত্য । বিষয়টি সম্ভবত প্রথাগত অর্থনীতি শাস্ত্রের ভ্যালু-এডিশন (মূল্য-সংযোজন) নয়, বিষয়টি মূল্য বৃদ্ধির বা দাম বৃদ্ধির (price), যার সাথে দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির চাহিদা সরাসরি জড়িত।

বিশ্বায়নের আওতায় মূল্য বিষয়ে প্রথাসিদ্ধ অর্থনীতির সীমাবদ্ধতার আরো উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন ধরুন, বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে প্রস্তুত যে জামাটি আমেরিকা-ইউরোপের বাজারে ১,৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ঐ একটি জামার জন্য আমাদের একজন বাংলাদেশী শ্রমিক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পাচ্ছেন মাত্র ১৫ টাকা (১২০গুণ পার্থক্য)। ভ্যালু-চেইনের এ দুর্গতি প্রথাগত অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিশ্লেষণ করবে? অথবা ধরুন আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি অথচ দেশের অর্ধেক মানুষ অভুক্ত। অবশ্য তথাকথিত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা একটি রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি: খাদ্য বলতে শুধু চাল-গম অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) বোঝানো হয় যা মানুষকে মোটা ও অলস বানায়, মাছ-মাংস অর্থাৎ প্রোটিন বোঝায় না যা প্রকৃত অর্থে ক্রমবর্ধমান পুষ্টিহীনতা হ্রাস করবে, অর্থাৎ খাদ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবে; সেইসাথে এ মুহূর্তে বাংলাদেশে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপাদন হয় তাকে কিলোক্যালরিতে (শক্তি) রূপান্তর করে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে তো ভাগফল হবে মাথাপিছু দৈনিক ৩০০০ কিলোক্যালরির বেশি অথচ এ হিসেবে ৪৪% মানুষ এখনও দরিদ্র কেন? (অর্থাৎ যারা মাথাপিছু দৈনিক ২১২২ কিলোক্যালরির কম ভোগ করেন)। অবস্থাটি এমন যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও তো অভুক্ত মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বিষয়টি কি শুধুই উৎপাদনের? শুধুই কি বণ্টনের? না'কি আরো কিছু সিস্টেমিক? মনে রাখতে হবে অবাধ বাজার অর্থনীতি দরিদ্র-বান্ধব নয়; অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বাজার-বিকৃত হতে বাধ্য। যে বিকৃতি রোধে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য অনস্বীকার্য। কিন্তু চলমান রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। সেইসাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য বিকৃতি (যেটা সরকারই করেন) এতই গভীর এক 'statistical economy' সৃষ্টি করে যেখানে এমনকি প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রও তার জ্ঞান প্রয়োগে ব্যর্থ হয়। সম্ভবত: অর্থনীতিশাস্ত্রকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে রেখে এ বিশ্লেষণ হবে অসম্ভব ও অসম্পূর্ণ। আর স্বাধীনতার চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কোনো অর্থনীতিবিদকে কেউ যদি বলেন তিনি রাজনীতি করেন সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু অভিযোগটা ধ্রুব সত্য হিসেবে মেনে নেবো। এ অভিযোগ আসলে কিন্তু কমপ্লিমেন্ট। কারণ, দরিদ্র এ দেশে অর্থনীতি শাস্ত্র যদি মানুষের বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ অভূক্ত, অর্ধভুক্ত, বঞ্চিত, দুর্দশাগ্রস্ত, নিপিড়ীত, লাঞ্ছিত, নি:সঙ্গ মানুষের কথা না বলে তাহলে ঐ শাস্ত্র কার উন্নয়নের, কিসের উন্নয়নের কথা বলে? সেই সাথে অর্থনীতিবিদরা যদি এ সবের কারণ হিসেবে অস্বাধীনতার (unfreedom) কারণগুলো উদঘাটন না করেন তা হলে সে কাজটি কে করবে?

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবক্তৃতায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর জোসেফ স্টিগলিজ আমাদের উদ্দেশ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কিছু কথা বলে গেছেন, 'এ দেশে দরিদ্রদের স্বার্থ নিয়ে লাগাতারভাবে বলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা খুবই কম। আপনারা মানব দারিদ্র ও মানব বঞ্চনার বিরুদ্ধে নির্মোহ সত্য কথা বলতে থাকুন, ... সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি কৌশল পরিবর্তনে সোচ্চার হোন। .... মনে রাখবেন

বাজার- অন্ধত্ব পরিহার না করলে খুব বেশি এগুনো যাবে না। 'আর আমাদের কাছের মানুষ, নোবেল বিজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেন বললেন, 'প্রকৃত উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করতে হলে মানুষের চয়নের স্বাধীনতা প্রশস্ত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে মানুষ যা হতে চায় তাই যেন সে হতে পারে; মানুষ যা করতে সক্ষম সেটাই যেন সে করতে পারে। .... মানুষের সৃজন ক্ষমতা অসীম'। সুতরাং দেশের সত্যিকার উন্নতি বিধানে নিশ্চিত করতে হবে মানুষের পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা, যার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা। যে দেশে এসবের কোনোটিই অন্তত নূন্যতম মাত্রায় অর্জিত হয়নি, যে দেশের বিকাশে এসব স্বাধীনতার অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির প্রবণতাটিই মুখ্য সে দেশের সমাজ সচেতন অর্থনীতিবিদ আর ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ আন্দোলন-এর মানুষদের দায়িত্ব কর্তব্য কি ধরনের হওয়া উচিত? নি:সন্দেহে তা হতে হবে মানবকল্যানমুখী যার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও মানবিক দারিদ্র স্থায়ীভাবে দূর হতে পারে।

দুই

অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয়ই দুর্বৃত্তায়িত

দেশের চলমান অর্থনীতি আর সংশ্লিষ্ট নীতি-রাজনীতি নিয়ে অনেকেই আজ সত্যিই দুশ্চিন্তিত। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আর এ উদ্বেগের ভিত্তি ইতোমধ্যে যথেষ্ট শক্তিমান হয়েছে যা ক্রমবর্ধমান হারে পুনরুৎপাদিত হচ্ছে: গত তিন দশকে সরকারিভাবে যে ২০০,০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ অনুদান এসেছে তার ৭৫% আত্মসাৎ (লুট) হয়েছে– দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিতে (inclusion of the excluded) কাজে লাগেনি; বছরে এখন ৭০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হচ্ছে (যা জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ); মানি-লন্ডারিং হচ্ছে বছরে ৩৪,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ; ৩০,০০০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ-অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে; গুটি কয়েক ক্ষমতাধর বছরে ৮,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ঘুষ খাচ্ছেন; আর ক্রমবর্ধমান ধন বৈষম্যের কথা তো সরকারিভাবেই স্বীকৃত– মাত্র ৫% ধনী পরিবার দেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৩০% দখল করে আছে (আসলে কালো টাকা যোগ করলে ৫% ধনীর দখলে হবে ৫০% আয়)। আর এসবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠির সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের শর্তাদি বিনষ্ট করছে; মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে কাজ করছে; দালাল পুঁজির বিকাশ ত্বরান্বিত করছে যে পুঁজি উৎপাদনশীল খাতে নয় অনুৎপাদনশীল খাতের বিকাশে অতি উৎসাহী; সরকারি- বেসরকারি খাতে জাতীয় সম্পদের বিপুল অপচয়ের কারণ হিসেবে কাজ করছে; প্রকৃত মানব উন্নয়ন অনিশ্চিত করছে; নগরায়নের নামে বস্তিয়ায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে; গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিঃস্বায়িত করে গ্রামে এখন ভিক্ষুকায়ণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। এসবই দেশের অধিকাংশ মানুষের অর্থনৈতিক

অবস্থার উত্তরোত্তর দ্রুতালয় দুর্গতির কারণ হিসেবে কাজ করছে, যার ফলে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে হ্রাস পাচ্ছে ক্রয়ক্ষমতা, আবার অন্যদিকে মানুষকে করছে অতিমাত্রায় বাজার নির্ভর। আর বাজারে চাল-আটার মূল্য বৃদ্ধির সামনে অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া ব্যাপক এ জনগোষ্ঠির তেমন কিছু করার থাকছে না । এসবই এক কথায় সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে শেষাবধি সমগ্র উপরিকাঠামোকেই (রাষ্ট্রের মতাদর্শসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান) জনকল্যাণবিমুখ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে, যার অন্তর্ভুক্ত আইন শৃংখলা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন, সংসদ, স্থানীয় সরকার, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রীয়-অরাষ্ট্রীয় ছোট-বড় ক্রয়-বিক্রয়।

অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনৈতিক দুর্বত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করেছে। দুর্বৃত্তায়িত এখন সমগ্র বাংলাদেশ। অর্থনীতি ও রাজনীতি যখন উভয়ই দুর্বৃত্তায়িত তখন মূল্যসন্ত্রাস নিয়মে রূপান্তরিত হবে– এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের মূল্য যুক্তিহীন হারে বাড়বে, আর কমপক্ষে একই হারে কমবে মানুষের দাম। যে কারণেই ১৪ কোটি মানুষের এ দেশে দুর্বৃত্তায়নের পরিণাম দাঁড়িয়েছে এমন যে খাদ্যগ্রহণের নিরিখে এখন ৭ কোটি মানুষ দরিদ্র আর মৌলিক চাহিদার মূল্যমানের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি; মোট ৪ কোটি যুবকের ২ কোটি বেকার; প্রতিবছর শ্রম বাজারে যে ২৫ লাখ মানুষ সংযোজিত হয় তার মাত্র ৫ লাখ কাজ পায়; ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, কাজের অভাব আর দ্রব্য মূল্যেরঊর্ধ্বগতি মানুষের স্বত্বাধিকার বঞ্চনা চিরস্থায়ী করছে; ৯ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সুযোগ বঞ্চিত; ৮ কোটি মানুষ কার্যত নিরক্ষর; স্যানিটেশন সুবিধে নেই ১০ কোটি মানুষের; ১১ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধে থেকে বঞ্চিত; বছরে ১৬ লাখ শিশু ৫ বছর বয়স পেরুনোর আগে মৃত্যুবরণ করছে, যে মৃত্যুর ৫০% দারিদ্র উদ্ভূত রোগ বালাই, যা সহজেই প্রতিরোধযোগ্য। অথচ যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে গড়ে ২-৩ বছরে আমরা যে পরিমাণ ব্যয় করি সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে কিন্তু এ দেশ থেকে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগ চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব।

তিন

পরিসংখ্যানগত তথ্য বনাম প্রকৃত তথ্য

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এ দেশে নতুন কথা নয়। তবে ইদানিং দ্রব্যমূল্য বেশ বেশি হারে বাড়ছে। এ বৃদ্ধি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ মানুষের আয় বৃদ্ধির হার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। ক্রমবর্ধিষ্ণু কর্মহীনতা, কর্মে নিযুক্ত জনগোষ্ঠির ব্যাপকাংশের সীমিত স্বল্প আয়, আর মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় আয় উত্তরোত্তর তেমন একটা বৃদ্ধি না পাবার কারণে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি মানুষের কষ্ট বৃদ্ধির কারণ হয়েছে– এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য সব সময়ই সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলে থাকেন দ্রব্যমূল্য বাড়েনি।

তবে টিসিবি আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি অবশ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা কিছু কিছু স্বীকার করে থাকেন। এসব স্বীকার-অস্বীকারে জনগণের কিছু আসে যায় না কারণ দ্রব্যমূল্য যে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে বেড়ে চলছে এবং যথেষ্ট বাড়ছে তা জনগণ– ভোক্তা স্পষ্ট জানেন। এমন কি সরকার প্রায়শ: যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য ইনডেক্স (consumer price index) প্রস্তুত ও প্রকাশ করে তাতেও জনগণের কিছু আসে যায় না। কারণ তা সবসময়ই প্রকৃত সত্য গোপন করে– এমনও হতে পারে তা সত্য গোপন করতেই বানানো হয়। আর সে কারণেই আমি বলি এ দেশে দু'টো ইকনমি আছে– একটা হলো স্টাটিসটিক্যাল ইকনমি (Statistical economy) আর অন্যটা প্রকৃত ইকনমি (Real economy)। আর এ ধরনের 'দ্ব্যর্থ অর্থনীতিতে' একই বিষয়ে মোটামুটি একই সময়ে– একই মুখে একবার বলা হবে 'না' দ্রব্যমূল্য বাড়েনি, আর একবার বলা হবে 'হ্যাঁ' দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। বলা হবে তা বেড়েছে তবে 'ওদের' কারণে; আর 'ওরা' হলো হয় বিদেশ, ডলার– না হয় বিরোধী দল, হরতাল ইত্যাদি।

সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) বা অর্থমন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ ব্যাংক দ্রব্যমূল্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে যে তথ্য প্রদান করে তা বিবেচনায় নেবার প্রয়োজন নেই এ জন্য যে প্রকৃত বাজারের সাথে ঐ তথ্যের কোনোই মিল নেই। তারা স্টাটিসটিক্যাল ইকনমির স্রষ্টা, কিন্তু ভোক্তার সামনে বাজারের দ্রব্যমূল্যের কথা বললে প্রকৃত ইকনমির কথাই বলতে হবে। উপরন্তু দ্রব্যমূল্যের মূল্যসূচক নির্ধারণে 'স্টাটিসটিক্যাল ইকনমি'র অনুসরণকারী উল্লিখিত সরকারি বিভাগ যে সব দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করে তার অধিকাংশই দরিদ্র জনগোষ্ঠি ভোগ করেন না (অথবা আর্থিক দৈন্যের কারণে করতে পারেন না)– অথচ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষের ক্ষেত্রেও ঐ সূচক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং সরকার ক্ষমতায় যাবার আগে যে প্রতিশ্রুতি দেয় যে ক্ষমতায় গেলে তারা মূল্য সন্ত্রাস দূর করবে তারা অন্তত: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অত্যুচ্চগতি স্বীকার করবেন না– তা স্বাভাবিক।

আসা যাক প্রকৃত অর্থনীতির কথায়। প্রকৃত অর্থনীতি বলে যে বাজারে সব দ্রব্যের মূল্যই বেড়েছে। সবচেয়ে বেড়েছে জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য। বি এন পি চারদলীয় সরকারের চার বছরে দ্রব্যমূল্য যে হারে (চার বছরের হার– বার্ষিক নয়) বেড়েছে তা হ'ল: মোটা চাল ৭২.৭%, আটা ৭৫%, সয়াবিন তেল ৭১.৯%, কাঁচা মরিচ ৪০০%, শুকনা মরিচ ও বেগুন উভয়ই ১০০%, রসুন ৫০%, পানি ২০%, কেরোসিন ৭৬.৫%, গ্যাস ১০০% (সারণি ৬ দ্রষ্টব্য)। দ্রব্যমূল্যের এ ধরনের বৃদ্ধির বিষয়টি কিভাবে দেখবো: প্রথমত: দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি আসলে হয়েছে কতটুকু? দ্বিতীয়ত: দ্রব্যমূল্যের এ বৃদ্ধির কারণে জনগণের দুর্দশা কতদূর বেড়েছে? জনগণের কোন অংশ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে/হচ্ছে? তৃতীয়ত: দ্রব্যমূল্যের এ বৃদ্ধি

বড় কাঠামোর মধ্যে অর্থাৎ দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে কিভাবে দেখবো? চতুর্থত: কেন এ বৃদ্ধি, কি এর কারণ, কে দায়ী? এসব প্রশ্নের উত্তর জরুরি ।

২০০১-২০০৫ পর্যন্ত চার বছরে আসলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি হয়েছে কতটুকু? সারণি ৪-এ প্রদেয় প্রকৃত বাজার তথ্যের ভিত্তিতে আমার হিসেবে চার বছরে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে ৯০% অর্থাৎ বছরে গড়ে ১৮% । অথচ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে মূল্যস্ফীতি বলছে ২০০২ সালের জুন মাসে ২.৯৫% থেকে ২০০৫-এর এপ্রিল মাসে ৬.৯০% (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে) । অর্থাৎ সরকারের প্রদত্ত মূল্যস্ফীতির হার প্রকৃত হারের তুলনায় তিনগুণ কম । এর অর্থ দ্রব্যমূল্য নিয়ে সরকার তিনগুণ মিথ্যে বলছে অথবা সত্য গোপন করছে ।

সারণি ১: চার (২০০১-২০০৫) বছরে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি

দ্রব্য	একক	২০০১	২০০৫	৪ বছরে মূল্য বৃদ্ধি(%) ২০০১-২০০৫
চাল (মোটা	কেজি	১১.০০	১৯.০০	৭২.৭
চাল (পাইজাম)	কেজি	১৩.০০	২৪.০০	৮৪.৬
আটা	কেজি	১২.০০	২১.০০	৭৫.০
সয়াবিন তেল	লিটার	৩২.০০	৫৫.০০	৭১.৯
লবন	কেজি	১০.০০	১৪.০০	৪০.০
চিনি	কেজি	২৮.০০	৩৮.০০	৩৫.৭
পিয়াঁজ	কেজি	১২.০০	২০.০০	৬৬.৭
কাঁচা মরিচ	কেজি	১৬.০০	৮০.০০	৪০০.০
শুকনা মরিচ	কেজি	৫০.০০	১০০.০	১০০.০
বেগুন	কেজি	১২.০০	২৪.০০	১০০.০
রসুন	কেজি	৪০.০০	৬০.০০	৫০.০
আলু	কেজি	৭.০০	১৩.০০	৮৫.৭
মুসুরি ডাল	কেজি	৩৫.০০	৫২.০০	৪৮.৬
ডিম	হালি	১১.৫০	২০.০০	৭৩.৯
গরুর মাংস	কেজি	৭০.০০	১২০.০০	৭১.৪
গুঁড়ো দুধ	কেজি	১৭০.০০	৩০০.০০	৭৬.৫
বিদ্যুৎ	ইউনিট	২.১৫	৪.০০	১৮৬.০
পানি	হাজার লিটার	৪.১৫	৫.০০	২০.৫
কেরোসিন	লিটার	১৭.০০	৩০.০০	৭৬.৫
গ্যাস	১ বার্নার	২১০.০০	৪২০.০০	১০০.০

চার

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি– মূল্যবৃদ্ধি নয় মূল্য সন্ত্রাস

চার বছরে (২০০১-২০০৫) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেড়েছে বছরে গড়ে ১৮% । এর সরাসরি অর্থ ব্যাপক জনগোষ্ঠির খাদ্য পরিভোগ ১০-১৮% কমেছে অথবা খাদ্য বাবদ উচ্চমূল্য পরিশোধ করতে অন্যান্য খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যোগাযোগ) ব্যয় কমাতে হয়েছে অথবা খাদ্য ও অন্যান্য খাতে আগের তুলনায় পরিভোগ কমাতে হয়েছে– অর্থাৎ যেটাই হোক জীবনমান অতীতের তুলনায় হ্রাস করতে হয়েছে । কেন? কারণ ১৪ কোটি মানুষের এদেশে ৯ কোটি ১০ লাখ মানুষ দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত আর ২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ মধ্য-মধ্যবিত্ত (৬০ লাখ উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ৪০ লাখ ধনী) ।

এই যে ১১ কোটি ৫০ লাখ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ অর্থাৎ দেশের মোট মানুষের ৮২ জন অতি নিম্নআয় এবং সীমিত স্বল্প আয়ের এসব মানুষ যারা দারিদ্রসীমার নিচে এবং/অথবা একটু উপরে ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের আর্থিক আয় এমনকি সরকারি হিসেবেও বাড়েনি । আর তা যদি গড়ে ২-৫% বেড়েও থাকে (সেটা অবশ্যই ঘটেনি) তাতেও দ্রব্যমূল্যের ১৮% বার্ষিক বৃদ্ধি কিভাবে মেটানো যাবে? আর আমাদের চরম বৈষম্যমূলক সমাজে অথবা যেখানে উৎপাদন ফল বিতরণের ক্ষেত্রে কোনো সমতা-মূলক নীতি বাস্তবে কার্যকর নয় (redistributive justice অর্থে) সেখানে গড় আয় বৃদ্ধি মানে ২-৫% এর বৃদ্ধি (৭০-৯০% মানুষের বৃদ্ধি নয়) । সুতরাং বাৎসরিক ১৮% দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সরাসরি অর্থ হলো দেশের ৮২% মানুষ স্বল্প পরিভোগের কারণে শারীরিকভাবে কার্যক্ষমহীন হচ্ছেন; অসুস্থতা বাড়ছে; অসুস্থতা প্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে; রুগ্‌ণ হচ্ছেন; আর মানসিকভাবে অবশ্যই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছেন । দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আসলে দেশে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে দারিদ্র পুনরুৎপাদন করছে । এ দারিদ্র আর্থিক ও মানবিক (economic and human poverty) উভয়ই । আমার প্রশ্ন এ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্যাচে ফেলে নীরব দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দিয়ে যে অসীম ও বংশপরম্পরা দুর্ভোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে এ ধরনের চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধমুলক কর্মকাণ্ডের দায় দায়িত্ব কে নেবেন?

দুর্বোধ্য এক প্যাচের মধ্যে পড়েছে এ দেশের মানুষ । একদিকে মানুষের দুর্দশা-দারিদ্র বাড়ছে আর সেই সাথে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, আর অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বাড়ার সাথে সাথে দুর্দশা-দারিদ্র আরো বাড়ছে । অর্থাৎ দুর্দশা-দারিদ্র বৃদ্ধির সব উপাদানই কাজ করছে আর একই সাথে পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বর্ধিত হারে দুর্দশা-দারিদ্র পুনরুৎপাদন করে চলেছে (Price as a means to reproduction of distress-destitution-deprivation-poverty) । জটিল এ বিষয়টি অন্যভাবেও বলা চলে– এ দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠির দুর্দশা-দারিদ্র স্বাধীনভাবে বাড়ছে; স্বাধীনভাবে বাড়ছে

দ্রব্যমূল্য; আর দ্রব্যমূল্যের এ বৃদ্ধি তাদের দুর্দশা-দারিদ্রকে আরো বাড়াচ্ছে। আবার শেষ বিচারে দুর্দশা-দারিদ্র ও দ্রব্যমূল্য–উভয় বৃদ্ধিরই সাধারণ কারণ হতে পারে দুর্বৃত্তায়িত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো (আলোচ্য রচনার পরবর্তী অংশে বিশ্লেষিত হয়েছে)।

দ্রব্যমূল্য নিয়ে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রও এ দেশে বিপদে পড়েছে। কারণ প্রচলিত অর্থশাস্ত্র বলে সরবরাহ কমলে মূল্য বাড়বে। কিন্তু সরকার তো বেশ কয়েক বছর ধরেই বলছে যে বাংলাদেশ এখন খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর তৎকালীন সরকার দাবি করেছিল যে বোরো মওসুমে বাম্পার ফলন হয়েছে। হিসেবটা এরকম: বোরো মওসুমে দেশে নীট ১ কোটি ৫০ লাখ টন ধান উৎপাদন হয়েছে যা চালে রূপান্ত র করলে দাঁড়ায় ১ কোটি টন। সেই সাথে গত মওসুমে গম উৎপাদন হয়েছে নীট ২০ লাখ টন, আর চাল-গম আমদানী হয়েছে মোট ৩০ লাখ টন। দৈনিক মাথাপিছু ৪০০ গ্রাম (চাল/গম) চাহিদানুযায়ী উলিখিত পরিমাণ চাল-গম এদেশের ১৪ কোটি মানুষের (যার মধ্যে প্রায় ১ কোটি শিশু) প্রায় ১২ মাস খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ বাজারে যে পরিমাণ খাদ্য শস্য ছিল তা দিয়ে আমন মওসুম পর্যন্ত সহজেই চলবে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বাজারে তথাকথিত চালের মূল্য বৃদ্ধি দেশিয় বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণ– এ কোনো যুক্তির কথা নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে সরবরাহের পড়তি দিয়ে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে না।

শুধু সরবরাহের নিরিখেই নয় চাহিদার নিরিখেও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বিশ্লেষণে প্রচলিত অর্থশাস্ত্র বিপদে পড়েছে। কারণ প্রচলিত অর্থশাস্ত্র বলে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া খুব দ্রুত (গত ৩/৪ বছরে) নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির তেমন কোনো কারণ এ দেশে ঘটেনি। কারণ প্রত্যেকের চাহিদা বাড়তে প্রত্যেকের হাতে যে অর্থ প্রয়োজন তা কোনো অর্থেই প্রবাহিত হয়নি অর্থাৎ ব্যাপক জনগোষ্ঠির ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়নি। এসব নির্দ্বিধায় বলা যাচ্ছে এ কারণে যে দেশে এখন ৩/৪ কোটি মানুষ বেকার; শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা আরও বেড়েছে; প্রতি বছরে যে ২৫ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে তার ২০ লাখই কোনো কাজ পাচ্ছে না; সরকারি হিসেবেই দারিদ্রসীমার নিচে (যারা গড়ে প্রত্যেকদিন ২১২২ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য পরিভোগ করেন) এখন দেশে ৪৪% মানুষের বাস (মৌলিক চাহিদার নিরিখে প্রকৃত দারিদ্রের হার আসলে আরো অনেক বেশি); সরকারি হিসেবেই গ্রামীণ মাথাপিছু আয় ১৯৯৯ সালের তুলনায় ২০০৪ সালে বলতে গেলে বাড়েনি (৫৫৯ টাকা থেকে ৫৬২ টাকা অর্থাৎ মাত্র ৩ টাকা বেড়েছে) কিন্তু এসময়েই অবমূল্যায়ন হয়েছে ২২% এরও বেশি; সরকারি খাতে অধুনা বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি প্রযোজ্য দেশের মাত্র ৫% পরিবারের ক্ষেত্রে, অবশ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নিরিখে এ বৃদ্ধি আসলে বৃদ্ধি নয়; সরকারি হিসেবেই পাঁচ বছরে (১৯৯৫/৯৬ - ২০০০) দারিদ্র পীড়িত সর্বনিম্ন ২০% পরিবারের আয় ১৯৯৫/৯৬ সালে দেশের পারিবারিক মোট

আয়ের প্রায় ৬% থেকে ২০০০ সালে ৫% এর নিচে দাঁড়িয়েছে, আর সর্বোচ্চ ২০% পরিবারে একই সময়ে তা ৫০% থেকে বেড়ে ৫৫%-এ দাঁড়িয়েছে– অর্থাৎ আয় বৈষম্য বেড়েছে যখন দরিদ্র ২০%-এর আয় হ্রাস পেয়েছে; সরকারি হিসেবেই ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ধনীদের আয় বেড়েছে ১৩.৩৬% আর দরিদ্রদের আয় কমেছে ৩.৫৬% (পভার্টি মনিটরিং সার্ভে ২০০৪, বিবিএস)। এসবের সাথে আমার হিসেবের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ১৮% বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধি (সরকারি হিসেবে বার্ষিক গড় ৪-৫%) যোগ করলে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যুক্তি আদৌ টেকে না।

অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে "স্টাটিসটিক্যাল ইকনমির" সাথে বেশ সাযুজ্যপূর্ণ কিছু যুক্তি দেখাচ্ছেন। যেমন– বন্যার কারণে পণ্য সরবরাহে সঙ্কট; বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্য, তেল, সার ও স্টীলের মূল্যবৃদ্ধি; গ্যাস-পানিসহ সরকারি সেবার মূল্যবৃদ্ধি; মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান হ্রাস তথা আমদানি ব্যয়বহুল হওয়া; সরকারের সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি ইত্যাদি। এসবের কোনোটাই গুরুত্বহীন নয়। কিন্তু কোনোটিই আসলে আমাদের দেশের চলমান নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সমগ্রক কারণ নয়– হতে পারে উপলক্ষ্য মাত্র। কারণ সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বেশি কার্যকর শক্তি হল– এডাম স্মিথের "অদৃশ্য হাত" (invisible hand of Adam Smith) আর ডেভিড রিকার্ডোর "রাজনৈতিক মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া" (political processing)– র সম্মিলন। আর তাই আমি মনে করি যে, বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ অনুধাবনে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের "চাহিদা-সরবরাহ" বিধির বিপরীতে রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরতা অধিকতর সঠিক ও কার্যকরী হতে পারে। বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যে ক্রনিক রূপ নিয়েছে তাতে এডাম স্মিথের একটি সহজবোধ্য বক্তব্য যথেষ্ট গভীর বলে মনে হয় "ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিরা কদাচিৎ একে অন্যের সাথে মিলিত হন। তবে কখনও কোনো সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে যদি মিলিত হন সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তারা জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির কোন কুট-কৌশল নির্ধারণ করে ফেলেন"। এটাই সম্ভবত সেই "সংগঠিত সিন্ডিক্যালইজম" যা দিয়ে আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনের মূল্য সন্ত্রাস সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই বিশ্লেষণ সম্ভব।

সব ধরনের অর্থনৈতিক যুক্তি ছাপিয়ে দ্রব্যমূল্য যে গতিতে বাড়ছে তাতে বলতেই হয় যে বিষয়টি আসলে মূল্য সন্ত্রাসের– সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির নয়। আমি যথেষ্ট জোর দিয়ে একথা বলছি এ কারণে যে আমার হিসেবে পাঁচ বছরে (২০০১-২০০৬)

‘মূল্য সন্ত্রাসের’ ফলে লুটকৃত অর্থ সম্পর্কিত মোদ্দা হিসেব

১.তৎকালীন সরকার ও তার ঘনিষ্টজনেরা– “সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট”– নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কৃত্রিমভাবে (artificially) বাড়িয়ে প্রায় ৫ বছরের শাসনামলে এ দেশের জনগণের কাছ থেকে মোট ২৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে।

২. মোট লুটের মধ্যে ১৯৩,৮১৭ কোটি টাকা (৬৮%) লুট করেছে খাদ্য-খাতে আর বাকী ৯২,২৯৩ কোটি টাকা (৩২%) লুট করেছে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে।

৩. কয়েকটি প্রধান খাতওয়ারি লুটের পরিমাণ: চালে ৭৭,৩৮৫ কোটি টাকা, ডালে ৮,৭৬০ কোটি টাকা, সয়াবিন তেলে ২,৫৫৩ কোটি টাকা, চিনিতে ৩,৪৪৭ কোটি টাকা, পেঁয়াজে ৩,৭৭৬ কোটি টাকা, মরিচে ৬,৫৫১ কোটি টাকা, বিভিন্ন ধরনের শাক-শবজি-ফলমূলে ৩৩,৩৩৪ কোটি টাকা, কেরোসিনে ৩,৫৪১ কোটি টাকা, ঘর ভাড়ায় (গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানিসহ) ৪৫,৬৮০ কোটি টাকা, যাতায়াত-পরিবহনে ১৪,৭৬৬ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ব্যয়ে ৪,২৬০ কোটি টাকা, শিক্ষায় ৮,৪০৬ কোটি টাকা।

৪. মোট লুটের ৭২% হয়েছে গ্রামে আর ২৮% হয়েছে শহরে।

৫. এ লুটের শিকার হয়েছেন ১ কোটি ৮২ লাখ দরিদ্র পরিবার (৯ কোটি ১০ লাখ মানুষ), ৪৮ লাখ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার (২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ), আর ৩০ লাখ মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার (১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ)।

১৪ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৩ কোটি মানুষ (দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত) চরমভাবে লুটের শিকার হয়েছেন। ‘মূল্য সন্ত্রাসের’ কারণে দরিদ্র মানুষকে পরিবার চালাতে গিয়ে হয় খাদ্যভোগ কমাতে হয়েছে, অথবা পুষ্টিহীন হতে হয়েছে, অথবা খাদ্য-বহির্ভূত খাতে (বিশেষ করে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও শিক্ষায়) ব্যয় কমাতে হয়েছে, অথবা অতীতের সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে, অথবা দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ (যাই ছিল) বেচতে হয়েছে (distress sale)– অর্থাৎ ৫ বছরে ২০০১-২০০৬ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে দরিদ্র মানুষ নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হয়েছেন। অনেকটাই অনুরূপ অবস্থা হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে। আর মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার– যাদের অনেকেই শিক্ষিত কিন্তু বেকার–এর অবস্থা দ্রুত অধোগতির

দিকে নেমে গেছে। অতএব, 'মূল্য সন্ত্রাসের' এ প্রক্রিয়ায় ১৩ কোটি মানুষের (দেশের ৯৪% মানুষ) দারিদ্র-দুর্দশা-অসহায়ত্ব বেড়েছে: দরিদ্র হয়েছে দরিদ্রতর; নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ দরিদ্র মানুষের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন; আর মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ অবশ্যই নিম্ন-মধ্যবিত্তের দলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তথাকথিত "ম্যাক্রো ইকনমিক স্ট্যাবিলিটি" স্রেফ কথার মার-প্যাচ– বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি মাত্র।

মূল্য সন্ত্রাসীরা গত ৫ বছরে যে ২৮৬,১১০ কোটি টাকা জনগণের কাছ থেকে লুট করেছে– সমপরিমাণ লুটের অর্থ দিয়ে যা যা ভাল কাজ করা সম্ভব ছিল:

১. পাকা (উন্নত মানের) প্রাইমারি স্কুল (প্রতিটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে) = ৫৭২,২২০টি (অথবা)
২. পাকা (উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ) মাধ্যমিক স্কুল (প্রতিটি ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে) = ৯৫,৩৭০টি (অথবা)
৩. আধুনিক হাসপাতাল (৫০ বেডের প্রতিটি ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে) = ৫,৭২২টি (অর্থাৎ
কমপক্ষে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে) (অথবা)
৪. বঙ্গবন্ধু সেতু (প্রতিটি প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে) = ৫৭টি (অথবা)
৫. পাকা রাস্তা (১ কিলোমিটার = ৩ কোটি টাকা ব্যয়) = ৯৫,৩৭০ কিলোমিটার (অথবা)
৬. ক্ষুদ্র শিল্প (প্রতিটি ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে) = ২৯ লাখ (অথবা)
৭. মাঝারি শিল্প (প্রতিটি ১ কোটি টাকা ব্যয়ে) = ২৮৬,১১০টি (অথবা)
৮. টাটা যে পরিমাণ বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে তার তুলনায় ঐ লুট= ১৯ গুণ বেশি (অথবা)
৯. কয়টি বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট হতে পারতো (এখন বাজেট ২২,০০০ কোটি টাকা) = টি (অথবা)(অর্থাৎ দেশের ১২টা বাজিয়েছে কারণ ঐ লুট দিয়ে ১৩ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট হতে পারে)
১০. প্রবাসিরা বছরে যে অর্থ দেশে প্রেরণ করেন তার তুলনায় ঐ লুট = ১২ গুণ বেশি (অথবা)
১১. দেশের সব বাড়ীতে বিদ্যুৎ দিতে যে অর্থ লাগবে তার তুলনায় = প্রায় ৩ গুণ বেশি (অর্থাৎ সব বাড়ীতে বিদ্যুৎ দিয়েও ১৮১,১১০ কোটি টাকা থেকে যাবে)।

উপরের হিসেব 'হয় এটা না হয় ওটা'-র ভিত্তিতে করা হয়েছে। এ পাটিগণিত সহজবোধ্য। আমি বিশ্বাস করি এ ধরণের হিসেব ওদের 'সুকীর্তি'-র উদাহরণ হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা জরুরি। তা সহজবোধ্য বিধায় দেশের এ প্রান্ত থেকে

ও প্রান্তের মানুষ বুঝবেন এবং তা অবশ্যই ফলপ্রদ হবে। এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো বিষয় নেই, কারণ এ সবই সত্য।

সারণি ২: বিএনপি চার দলীয় সরকারের (২০০১-'০৬) পাঁচ বছরে মূল্য সন্ত্রাসের ফলে জনগণকে অতিরিক্ত যা ব্যয় করতে হয়েছে।

পরিবারের ধরন	পরিবারের সংখ্যা (কোটি)	জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয় (কোটি টাকায়) (বিএনপি সরকারের প্রায় ৫ বছরে)
দরিদ্র	১.৮২	১৭৭,৯৫৪
নিম্ন-মধ্যবিত্ত	০.৪৮	৫৬,৯৮১
মধ্য-মধ্যবিত্ত	০.৩০	৫১,১৭৫
মোট	২.৬	২৮৬,১১০

(মোট মানুষ ১৩ কোটি)

সারণি ৩ : বিএনপি চার দলীয় সরকারের প্রায় ৫ বছরে মূল্য সন্ত্রাসের ফলে জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয়:

দ্রব্য	জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয় (কোটি টাকায়) (বিএনপি সরকারের প্রায় ৫ বছরে)
চাল (মোটা)	৭৭,৩৮৫
আটা	২,৫৫৬
ডাল	৮,৭৬০
সয়াবিন	২,৫৫৩
লবন	১,৫৬০
চিনি	৩,৪৪৭
পেঁয়াজ	৩,৭৭৬
মরিচ	৬,৫৫১
শাক-শব্জি	৩৩,৩৩৪
গুঁড়ো দুধ	১,৬৫৯
কেরোসিন	৩,৫৪১
ঘর ভাড়া (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি খরচসহ)	৪৫,৬৮০
যাতায়াত	১৪,৭৬৬
স্বাস্থ্য : চিকিৎসা ব্যয়	৪,২৬০
শিক্ষা	৮,৪০৬

পাঁচ

তিন দশকে দুর্বৃত্তায়নের খেরো খাতা

তাহলে গত তিন দশকের উন্নয়ন ইতিহাসে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতি ও সমাজের সকল স্তরে দুর্বৃত্তায়ন ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আমরা বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখার একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছি। এটি এমন এক পরিবেশ যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের আরো বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ এমন পরিস্থিতি যা মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়াগুলো নস্যাৎ করে দেয়। গত তিন দশকের হিসেবের খেরো খাতা প্রমাণ করছে যে, এখন এক সর্বগ্রাসি লুণ্ঠন-সংস্কৃতি আমাদের পেয়ে বসেছে। যা কিছু মানব উন্নয়নের বিরুদ্ধে যায়, যা কিছু দুর্বৃত্তায়নে সহায়ক, সার্বিক পরিস্থিতি যেন সেগুলোর প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করছে। রচনাটির পরবর্তী অংশে তিন দশকের খেরো খাতা একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা তুলে ধরেছে: মানব উন্নয়নের জন্য অনুকূল সকল সূচক ক্রমশ নিচের দিকে নামছে এবং দুর্বৃত্তায়নের প্রতি অনুকূল সূচকগুলো আরও শক্তিশালী হচ্ছে। গত তিন দশকে হিসেবের খেরো খাতা যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও উন্নয়ন বিরোধী সেগুলো শনৈঃ শনৈঃ প্রবৃদ্ধি লাভ করছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি।

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশের খেরো খাতা: তিন দশকের প্রবণতা:

ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা প্রদর্শনকারী সূচক

১.কালো অর্থনীতি / কালো টাকা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লুটপাট, অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, টাকা পাচার, কুশাসন, নিপিড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার, হত্যা, শারীরিক আঘাত

২.কোটিপতি এবং ভিক্ষুক, জমি ও জলাশয় জোর করে দখল, নতুন গাড়ী ও ফ্লাট, ভিক্ষাবৃত্তির নতুন কৌশল, জাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা, তাপ ও শৈত্যপ্রবাহে অসুস্থ্য ও নিহতের সংখ্যা

৩.বহুতল ভবন, ইটের ভাটা, ইট ভাঙ্গা নারী ও শিশুর সংখ্যা

৪.সুপার মার্কেট, গাড়ি বিক্রির দোকান, গার্মেন্টস কারখানা, নারী শ্রমিক, পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা

৫.গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে নিরুপায় স্থানান্তর, বস্তিবাসীর সংখ্যা, অনানুষ্ঠানিক খাত, নিউক্লিয়ার পরিবার, শিশু-নারী ও প্রবীণদেন বঞ্চনা ও দুঃখ কষ্ট

৬.বৈধ এবং অবৈধ আমদানী ও রপ্তানী, অবৈধ আয়, ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন

৭.বিদেশি মঞ্জুরী ঋণ দ্বারা পরিচালিত প্রকল্প, এনজিও কর্মকা

৮.জৈব সার, কীটনাশক ও বালাইনাশক এবং উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত ব্যবসা, কৃষিজ পণ্যের কালোবাজারি

৯.যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, কম্পিউটার ও ব্যবসা প্রশাসন বিষয়ে ছাত্রের সংখ্যা

১০.নারীর কর্মসংস্থান এবং রোগবালাই, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচার

১১.বেসরকারি খাতে বানিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা (ইংলিশ মিডিয়ামসহ), শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য

১২.ব্যবসায়িক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, পীর-ফকিরদের সংখ্যা, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিকদল, ধর্মের নামে সহিংসতা, অন্যান্য ধর্মের লোকজনের অস্বস্তি, নিয়তির উপর নির্ভরতা, হস্তরেখাবিদদের সংখ্যা

১৩.ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিক, উচ্চ রক্তচাপ ও দারিদ্র-সঞ্জাত রোগবালাই, স্বাস্থ্য খাতে পারিবারিক ব্যয়, স্বাস্থ্যের পেছনে ব্যয়ের কারণে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া

১৪.অনুৎপাদনশীল খাতে প্রকৃত ব্যয়, সামরিক প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, আমলাদের সাথে জনগনের দূরত্ব বৃদ্ধি, আদালতের উপর প্রভাব বিস্তার

১৫.নির্বাচনী ব্যয়, নির্বাচনে কালো টাকার মালিকদের প্রতিযোগিতা, জনগণ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব

১৬.জাতীয় সংস্কৃতি চর্চা, সংহতির অনুভূতি, পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা, মানবিক মূল্যবোধ-নৈতিক ও নান্দনিক

১৭.রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হিসাবে রাজনীতি, স্বৈরাচার, কল্যাণমুখী রাজনীতির জন্যে (সুপ্ত) দাবি

নিম্নগামী প্রবণতা প্রদর্শনকারী সূচক

১.অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, জাতীয় পুঁজি সৃষ্টি, শিল্পায়ন, সাধারণ গার্হস্থ্য অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার উপযোগি অর্থনৈতিক সক্ষমতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কালো অর্থনীতি প্রতিরোধকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি

২.অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, কর্মসংস্থান, সম্পদের উপর দরিদ্র মানুষের মালিকানা ও প্রবেশাধিত ৩.দরিদ্রদের জন্য গৃহায়ন সুবিধা, পরিবেশের ভারসাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ

৪.শিল্পকারখানা, ওয়ার্কশপ, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, শিল্পকারখানায় মূল্য সংযোজন

৫.ভূমির উপর দরিদ্র মানুষের নিয়ন্ত্রণ, পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান, প্রকৃত আয়/বেতন, যৌথ পরিবারের বিস্তৃতি

৬.মানুষের সম্ভাবনা ও সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, শিল্পায়নের পেছনে পুঁজির ব্যবহার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন

৭.স্থানীয় উদ্যোগ, স্থানীয় সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ

৮.ভূমির প্রাকৃতিক উর্বরতা, বর্ষপ্রাচীন প্রচলিত বীজ প্রকরণ, কাঠ, মাছ, পরিবেশগত ভারসাম্য, কৃষি পণ্যের দাম

৯.সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রাযুক্তিক ভিত্তি, বিজ্ঞান ও দর্শনে ছাত্র সংখ্যা, বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান

১০.নারী কর্মীদের প্রকৃত বেতন/ আয়, নারী ও শিশুর সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর দক্ষতা

১১.সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি স্কুল ও স্বল্প ব্যয়ের বেসরকারি স্কুলগুলোয় শিক্ষার মান, শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা, মৌলিক শিক্ষার পেছনে সরকারি বরাদ্দ

১২.অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান মনস্কতা, আলোকিত বিশ্বদৃষ্টি, বিজ্ঞান ও জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভা, সভ্য জীবনযাত্রা, ধর্মনিরপক্ষ অনুভূতি-আচরণ-মনোভাব

১৩.প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান, জনস্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দক্ষতা

১৪.সুশাসন, ন্যায়বিচার, ব্যক্তির নিরাপত্তা বোধ, মানুষের সমৃদ্ধির জন্যে প্রকৃত সরকারি ব্যয়, উৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়

১৫.নির্বাচিত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের আস্থা, আলোকিত রাজনীতি

১৬.ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি অবলোকন ও শ্রবণের পেছনে সময় অপচয়, পারস্পরিক আস্থাহীনতা

১৭.জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের ভালোবাসা, রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম, জ্ঞান-ভিত্তিক এবং মানবিক আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গত তিন দশকে কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠি নিঃস্ব হয়েছেন; সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি; সরকারি প্রকৃত ব্যয়বরাদ্দ জনকল্যাণ খাতে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ। এ সব কিছুর ফলে মানুষের মুক্ত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগসমূহ ক্রমাগত সীমিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গত তিন দশকের উন্নয়নে আমরা বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতিতে আরো জোরালোভাবে ফিরে গেছি: এই দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী মাত্র ১০ লাখ মানুষ। ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন এরা চালকের আসনে থাকে; অপর পক্ষে, অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ– এরা বহিস্থ, বঞ্চিত, নিঃস্ব, ছিটকে পড়া মানুষ।

ছয়

অর্থনীতি শাস্ত্রের উত্তরণ জরুরি

এ সবই ঘটেছে তখন যখন আমাদের সংবিধান বলছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যাস্ত থাকিবে' (অনুচ্ছেদ ৭)। অবস্থা যে মাত্রায় খারাপ তাতে তো বলতে হয় দুর্বৃত্তায়ন দ্বারা সৃষ্ট বঞ্চনার ফাঁদ ছিন্ন না করে সমস্যার সমাধান হবে না। দুর্বৃত্ত ও দারিদ্র লালন– উভয়ই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। সমস্যার সমাধানে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব ও জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। অর্থনীতবিদ হিসেবে আমরা সম্ভবতঃ সংবিধানের বিধান মোতাবেক জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চাহিদা (যা পূরণে সংবিধান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে) আর প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র যা সরবরাহ করছে- এ দুয়ের ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান ফারাক নিরূপণ করতে পারি; ফারাকের কারণসমূহ উদঘাটন করতে পারি; ফারাক হ্রাসে যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবনা পেশ করতে পারি। সেক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থশাস্ত্রকে বৃহৎ গ ি রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রের অনুগত শাস্ত্র হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে হবে। একজন অর্থনীতিবিদ তো মানবকল্যাণবিরোধী বা মানবকল্যাণবিমুখ হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রচলিত ও প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের বাইরে আসতে হবে। সময় ও সমাজ সেটাই দাবি করে।

সা ক্ষা ৎ কা র

দ্রব্যমূল্যর উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা

ব দ রু দ্দী ন উ ম র

[আজ ২৩ মার্চ ২০০৯। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে আমরা মুখোমুখি হয়েছি দেশের প্রগতিশীল চিন্তার ধারক, নিষ্ঠাবান রাজনীতি-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক জনাব বদরুদ্দিন উমরের। আজ তাঁর কাছ থেকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ক্রয় ক্ষমতা ও বিশ্বমন্দা নিয়ে কিছু প্রশ্নের জবাব জানতে চাইব।

জন্ম ২০ ডিসেম্বর ১৯৩১ বর্ধমান, পশ্চিমবাংলায়। বাবা আবুল হাশিম, মা.....,স্ত্রী.....।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৬৮-তে পদত্যাগ। প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৭০ এর অধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: সাম্প্রদায়িকতা ১৯৬৬, সংস্কৃতির সংকট ১৯৬৭, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা ১৯৬৮, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১৯৭০, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক ১৯৭২, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ১৯৭৪, বাঙলাদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা ১৯৭৪, যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ ১৯৭৬, যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ ১৯৭৪, ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ১৯৮০, বাঙলাদেশে মার্কসবাদ ১৯৮১, বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক ১৯৮৭, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ১৯৮৪, মার্কসীয় দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ১৯৮৬, বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন ১৯৮৬, ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল ১৯৮৫, বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ১৯৮৭, বাঙলাদেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা ১৯৮৭, বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ১৯৮৯, বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ১৯৮৯, সামরিক শাসন ও বাঙলাদেশের রাজনীতি ১৯৮৯। উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা: সুকান্ত সমগ্র, স্টালিন প্রসঙ্গ, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ন ও সংগ্রাম, নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৭২ প্রত্যাখ্যান, ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার ১৯৭৪ প্রত্যাখ্যান। তাঁর লেখা প্রধানত উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী। সাম্প্রদায়িকতা, অপসংস্কৃতি, ভাষা আন্দোলন, কম্যুনিস্ট আন্দোলন, কৃষক সমাজ, মুক্তিযুদ্ধ, মার্কসবাদ, গণতন্ত্র,

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, নারী, সামরিক শাসন এবং চলমান নানাবিধ সমস্যা নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখি করছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলার ক্ষমতা মুসলমানদের হাত থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে চলে গেল এবং ক্ষমতাশূন্য সেই মুসলমান অবাঙালি ছিল, তা সত্ত্বেও ঘটনার প্রভাব বাঙালি মুসলমানদের মনস্তত্ত্বের ওপরও অনেকখানি পড়েছিল। সে প্রভাবের কারণে বাঙালি মুসলমান ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। এতে করে নিজেদের চরম ক্ষতি হয়েছিল বটে। এছাড়া অন্য আরও নানা কারণে পিছিয়ে পড়েছিল বাঙালি মুসলমান। তবে তারা আবার মোটাদাগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। মাথাচাড়া দিয়ে-ওঠা বাঙালি মুসলমানদের চিন্তক-ধারার সবচেয়ে বিকশিত ব্যক্তিত্ব বদরুদ্দীন উমর। বলা যায় তাঁকে বুঝতে পারলে আজকের বাঙালি মুসলমানকে বোঝা যাবে। এরকম দৃঢ়চিত্ত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব বাঙালিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, মানবেন্দ্রনাথ রায়, ভবানী সেন প্রমুখ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের বাঙালির চিন্তাজগৎ আজ দুশ্চরিত্রদের মুখোশের স্তূপের নিচে ঢাকা পড়ে আছে; জাতি আজ বিব্রত, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিপন্ন, গার্জিয়ানশূণ্য। জনাব উমরের চিন্তা সম্পর্কে অনেক রকম বিভ্রান্তি ছড়ানো আছে ; যেখান থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য বিশেষ করে তরুন সমাজকে তাঁর রচনা পাঠ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে 'হালখাতা'র নেয়া তাঁর সিরিজ সাক্ষাৎকার কিছুটা হলেও সহযোগিতা করবে।]

হালখাতা

বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে দ্রব্যমূল্যর উর্ধ্বগতি লক্ষনীয়। বিষয়টি অনেক দিন ধরে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আলোচিত হচ্ছে। মানুষের জীবনের সঙ্গে এতো নিবিড়ভাবে সর্ম্পকিত 'দ্রব্যমূল্যর উর্ধ্বগতি' বিষয়টিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

বদরুদ্দীন উমর

দ্রব্যমূল্য এমন একটা জিনিস যা কখনো কমেছে বলে কেউ কোনোদিন শোনেনি। বলা হয়ে থাকে শায়েস্তা খানের আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। তারপর থেকে চালের মূল্য তো বেড়েই চলেছে। দ্রব্যমূল্যর বিষয়টি টাকার মূল্যের ওপরেও অনেকটা নির্ভরশীল। যখনটাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত আর আজকে আট মণ চালের যে দাম, সেটা পার্থক্য হয়েছে প্রধানত টাকার মূল্য মানের কারণে। এক সময় হয়ত একজন সৈনিক মায়না পেত চার আনা বা আট আনা। কিন্তু বর্তমানে একজন সৈনিক তার চেয়ে অনেক বেশি বেতন পায়। তা স্বত্ত্বেও সৈনিকের ক্রয় ক্ষমতা যে বেড়েছে তা কিন্তু নয়। কথা হচ্ছে দ্রব্যর মূল্য বাড়বে এটা খুব স্বভাবিক বিষয়। কিন্তু সে অনুসারে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে কিনা সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

এক সময় বাজার ব্যবস্থা ছিল না, তখন এক জনের তৈরি পণ্য আরেক জনের তৈরি পণ্যের সাথে বিনিময় করতো। তারপর যখন মুদ্রার প্রচলন হলো এবং বাজার প্রথা প্রতিষ্ঠা পেল তখন থেকে বাজারকে প্রভাবিত করার একটি বিষয় চলে এলো। এখন তো সারা দুনিয়াটাই কেনাবেঁচার বাজারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশও সে বাজারের বাইরে নয়। আর বাজার মানেই তো কোনা না কোনো প্রভাব সেখানে কাজ করবেই। তো দেখা যাচ্ছে শায়েস্তা খানের আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত পণ্যের দাম যেভাবে বেড়ে বেড়ে আসছে ওটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। যার সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে বাজারে প্রভাব সৃষ্টিকারী নানা অপশক্তির নিয়ন্ত্রণ।

হালখাতা

কিন্তু বিগত কয়েক সরকারের আমল থেকে আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্যর ক্রমাগত উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ সে অনুসারে বাংলাদেশের মানুষের আয় রোজগার বাড়েনি। এতে করে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

বদরুদ্দীন উমর

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় নানা সময়ে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। একইভাবে আমাদের এখানে সাতচল্লিশের ভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন কিংবা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পণ্যেমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। একরম বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে পণ্যমূল্য বাড়ার হয়তো নানা যৌক্তিক কারণ থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে সে রকম কোনো কারণ ঘটেনি। বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বাড়ার তাহলে কী কারণ থাকতে পারে, সে প্রশ্ন আমারও।

বাজার প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই ব্যবসায়ীদের ভেতর থেকেএকটি মহল নানা রকম পণ্য জমা করে ধীরে ধীরে বিক্রি করতে শুরু করে। এতে করে এই মহলটি বাজারের চাহিদা অনুসারে পণ্য সরবরাহ না করে, নিজেদের লাভ বা প্রফিটের উচ্চ হার বজায় রেখে জমাকৃত পণ্যেকে অল্প অল্প করে বাজারে ছাড়তে থাকে। আমাদের জীবদ্দশায় আমরা দেখেছি এক ধরনের ব্যবসায়ি রাখি মালের কারবার করতো। যখন কোনো শস্য উঠতো তখন এরা গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে ঘুড়ে এই শস্য অল্প দামে কিনে রাখতো এবং অন্য ঋতুতে সেই শস্য তারা বেশি দামে বিক্রি করতো। যেটা হতো নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক যার প্রভাব অতোটা ব্যাপক আকার ধারণ করতো না। কিন্তু বর্তমানে সেই রাখির কারবার ছোট ছোট এলাকার মধ্যে সীমিত না থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অতি বিস্তৃত আকারে হচ্ছে এবং সেটা সংখ্যার দিক থেকে

অনেক কারবারীদের মধ্যে না থেকে হাতগোনা স্বল্পসংখ্যক বিশাল পুঁজির মালিকদের মধ্যে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। ফলে স্বল্প সংখ্যক পুঁজির মালিক একত্রিত হয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। যেখানে সধারণ মানুষের সমস্যা, দুঃখ-দুর্দশার কোনো মূল্য নেই।

হালখাতা

কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে, বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি স্বত্ত্বেও সেরকম কোনো দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়নি। আপনার কোনো এক লেখায় আপনি অবশ্য সেটাকে নিরব দুর্ভিক্ষ বলেছেন। প্রশ্ন হলো নিরব বা সবর যে ধরনের দুর্ভিক্ষই হোক না কেন তাতে প্রাণহানী ঘটেনি। এটা কী করে সম্ভব হলো?

বদরউদ্দীন উমর

প্রাণহানী ঘটেনি কথাটি ঠিক নয়। তাহলে কীভাবে সেই প্রাণহানী ঘটেছে? ঘটেছে সেটা অপুষ্টিতে। আমাদের খেটে খাওয়া মানুষগুলো কী খায়? আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, তারা শুধু ভাতই খাচ্ছে কিন্তু শরীরের জন্য তো শুধু ভাত হলেই হয় না! ভাতের বাইরে আরও যে সকল পুষ্টিকর খাদ্য তাদের দরকার সেটা তো তারা একেবারেই পায় না। এতে করে দেখা যাচ্ছে তারা মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করছে না কিন্তু অপুষ্টির কারণে রোগে-শোকে ধুকে ধুকে মারা যাচ্ছে। এটাকেই আমার একটি লেখায় আমি নিরব দুর্ভিক্ষ বলেছিলাম।

হালখাতা

আপনি তো বল্লেন দ্রব্যমূল্য কখনো কমেছে এমন কথা কেউ কোনো দিন শোনেনি, কিন্তু প্রশ্ন হলো এই ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির যে বিষয়টি এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? একা কি এমনই স্বাভাবিক বিষয় যেটা আসলে বিশেষ সমস্যাই নয়?

বদরুদ্দীন উমর

এটা সমস্যাই নয় মানে কি? বরং সমস্যা বলেই তো সেটা নিয়ে এতো কথা হচ্ছে! আমি বলেছি যে, বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে ক্রাইসিসের সময়ে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। সেটা একটা দিক; এক সময়ে বেঙ্গল নামে যে অংশটি ছিল সেখানে তখন চাল আসত নেপাল থেকে। একসময় নেপাল থেকেও চাল আসা কমে গেল এবং ৪৭, ৪৮, ৪৯ এর দিকে এখানে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, যার কথা আমার ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত বই ২য় খণ্ডের মধ্যে ১ম অংশে বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। আরেকটা দিক হলো, আমাদের এখানে বা বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় তো দ্রব্যমূল্যর উর্ধ্বগতি রোধ করবার জন্য কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনের সময়ে দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেয়া হয়েছিল এবং বিভিন্ন পণ্যের দাম এমন স্ট্যাবল অবস্থায়

তখন ছিল যেখান থেকে সামান্য হেরফের হলেই মানুষ সহজে তা বুঝতে পারত। যে কারণে তখন দ্রব্যমূল্য বাড়ার কোনো উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়, দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে অটমেটিক্যালি শ্রমিকদের আনুপাতিকভাবে মায়না বেড়ে যেত।

হালখাতা

কিন্তু তখন দ্রব্যমূল্য ঠিক রাখতে তো স্ট্যালিনকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এমন কি বহু মানুষ হত্যা পর্যন্ত করতে হয়েছিল। সেই মানুষ হত্যার বিষয়টিকে আপনি কিভাবে বিচার করবেন?

বদরুদ্দীন উমর

বিষয়টি ড. জিভাগো উপন্যাসে আছে যে, সেখানে দুর্ভিক্ষের কথা যেমন আছে আবার স্ট্যালিন গুলি করে মানুষ হত্যা করেছিল সেটাও আছে। কথা হলো, ব্যক্তিগতভাবে আমি তো হত্যা সমর্থন করি না। কিন্তু কয়েক হাজার মানুষ হত্যা করলে যদি কোটি কোটি মানুষকে বাঁচানো যায়, তাদের মুখে অন্ন দেয়া যায়, তাদের বাসস্থান-চিকিসৎসার ব্যবস্থা করা যায়– তাহলে সেই হত্যা তো অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্ট্যালিন সেটাই করেছিলেন। কুলাকরা যখন পন্য মজুদ করে দাম বাড়িয়ে দিল এবং দেশের বাইরে থেকে পন্য আসার পথও বন্ধ করে দিল তখন স্ট্যালিনের করার আর কিছুই ছিল না।

হালখাতা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পণ্য মজুতকারী, ফটকা কারবারী এবং সিণ্ডিকেট তৈরি করে যারা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে রাখছে তাদের দমনের ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী?

বদরুদ্দীন উমর

এই ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ কে শুনবে? পরামর্শ তো মাঝখান থেকে দেয়া যায় না! যেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি সেখানে হঠাৎ করে বড় কোনো পদক্ষেপ নেয় যায় না। তবে আমি বিশ্বাস করি, এই অবস্থারও পরিবর্তন হবে। এদেশের মানুষ ঊনসত্তরে, একাত্তরে, নব্বইয়ে–এরকম অতিতের নানা ক্রাইসিসের সময়ে এগিয়ে এসেছে, দ্রব্যমূল্য তাদের ক্রয়ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেলে তারা এর সমাধানের পথ হয়ত ঠিকই বের করে ফেলতে পারবেন।

হালখাতা

কিন্তু বড় কোনো পরিবর্তনের জন্য তো উপযুক্ত নেতৃত্ব দরকার হয়। বাংলাদেশের জনগণ হয়ত একটা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে– কিন্তু সঠিক নেতৃত্ব কোথায়?

বদ্দীরুদ্দীন উমর

নেতৃত্ব তো আকাশ থেকে আসবে না! এই মাটি এখানকার বাস্তবতা থেকেই নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে। সময়ই সেই নেতৃত্ব সৃষ্টি করে দেবে।

হালখাতা

আমাদের কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আদমজীর মত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ঋণ যেভাবে বেড়েছে, প্রতিটি গ্রামের মানুষ এখন ঋণের ভারে জর্জরিত। এরকম ঋণ নির্ভর ফাঁপা একটি অবকাঠামো দ্রব্যমূল্য অস্থিতিশীল হওয়ার পেছনে কোনোভাবে ভূমিকা রাখছে কি-না?

বদরুদ্দীন উমর

গ্রামের অধিকাংশ কৃষক ক্ষুদ্র ঋণের অভিশাপে জর্জরিত। একজন কৃষক বাধ্য হয়ে মাত্রাতিরিক্ত সুদের শর্তে ঋণ নিয়ে থাকে। যে কারণে তুলনামূলক অধিক মূল্যে কৃষককে তার শস্য বাজারে বিক্রি করতে হয়, যে অধিক মূল্যর অর্থ কৃষক না পেয়ে সেটা যায় ক্ষুদ্র ঋণের কারবারীর পকেটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের আয় রোজগারের তুলনায় বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণের অধিক সুদের হার একটি বড় কারণ।

ধরা যাক গ্রামের কোনো কৃষক অধিক হারে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ধানের চাষ করলো; সেই ধান ওঠার পর সে যখন সেটা বিক্রি করতে যাবে তখন ঐ ধানের প্রকৃত মূল্যের সাথে ঋণের সুদের পরিমাণটাকে অন্তর্ভুক্ত করেই বিক্রিমূল্য নির্ধারণ করছে। কাজেই দেখা যাবে অধিক সুদের ক্ষুদ্র ঋণের কারণেও পণ্যের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে। অথচ সেই অধিক মূল্যমানের অর্থটা কৃষক পাচ্ছে না, পাচ্ছে মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবসায়ী।

ক্ষুদ্র ঋণ যখন ছিল না, তখন কি কৃষক চাষাবাদ করেনি? অবশ্যই করেছে। তখন কৃষক সমস্যায় পড়লে সরকার বীজ, সার বা ঔষধে ভর্তুকী দিয়ে সমস্যার সমাধান করতো। তখন সরকার সেটা না করলে দাবি উঠতো, আন্দোলন হতো, লেখালিখি হতো। সে কারণে পণ্যমূল্যও অস্বাভাবিক অবস্থায় যেত না। মাইক্রো ক্রেডিট তো আমাদের সর্বনাশ করেছে, একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে। কত লোক কিস্তির টাকা দিতে না পেরে সুইসাইড করেছে তার হিসেব নেই, কেননা সেই সব খবর সংবাদপত্রে আসে না।

হালখাতা

আপনি যে রাখি কারবারের কথা বললেন সেটা বাংলাদেশের বর্তমান পেক্ষাপটে মধ্য স্বত্ত্বভোগী মজুদ কারবারীদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। পার্থক্য হলো এখানকার মজুতদারদের মতো আগের দিনের রাখি কারবারীরা এতটা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার

করতে পারতো না। প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের বর্তমানের প্রভাব বিস্তারকারী ব্যবসায়ী মহল যারা সিণ্ডিকেট তৈরি করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করছে, এদের রোধ করা যায় কীভাবে?

বদরুদ্দীন উমর

হ্যাঁ এটা তো ঠিকই যে আগেকার রাখি কারবারীদের তুলনায় এ কালের মধ্য স্বত্ত্বভোগী মজুতদারেরা অনেক বেশি প্রভাবশালী। আগেকার দিনের রাখি কারবারীরা সিণ্ডিকেট তৈরি করতে পারতো না। কারণ তারা ছিলো সংখ্যায় অনেক বেশি এবং তাদের মধ্যে সে ধরনের কোনো ঐক্যও ছিলো না। পক্ষান্তরে, এ যুগের মজুতদারগণ সংখ্যায় কম এবং দেশব্যাপী ব্যবসা করার জন্য এদের মূলধনও অনেক বেশি; সে কারণে হাতেগোনা এই মজুতদারেরা সহজেই সিণ্ডিকেট করে দ্রব্যের মূল্য তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা নির্ধারণ করে দেয়। যে বৃদ্ধিকৃত মূল্য কোনোভাবেই ক্রেতা সাধারণের আয়ের যে বৃদ্ধি তার ওপর নির্ভর করে হয় না। এটা একচেটিয়া মজুতদারদের স্বার্থের জন্য হয়ে থাকে।

হালখাতা

কিন্তু এই সিণ্ডিকেট তৈরি হয় কী কারণে?

বদরুদ্দীন উমর

সিণ্ডিকেট তৈরি হয় শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে। গত ত্রিশ বছরে যে সকল রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে এবং সরকার গঠন করেছে তাদেরই আপন জনেরা এই সিণ্ডিকেট তৈরি করেছে। ১৯৯১ সালে বি এন পি যখন ক্ষমতায় এলো তখন খালেদা জিয়ার ছেলেরা অতটা সাবালক ছিলো না। পরে ২০০১ সালে যখন বি এন পি ক্ষমতায় আসে তখন তার ছেলেরা যথেষ্ট সাবালকত্ব নিয়ে দেশের সম্পদ লুট করলো। এছাড়া আরো অন্যান্য লুটতরাজ এবং সিণ্ডিকেটের সাথে যারা যুক্ত, দেখা যাবে এরা তাদেরই লোক। কাজেই এসব দূর করতে হলে অবশ্যই রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে হবে। আবার শেখ মুজিবের সরকার তথা আওয়ামীলীগের সরকার তারাও তো তখন মজুতদারের কাছ থেকে খাদ্য শস্য ছিনিয়ে আনতে পারলো না। শেখ মুজিবর রহমান কী মজুতদারদের পিটিয়ে সোজা করে দিতে পারতেন না? নিশ্চয়ই পারতেন। বামপন্থী নেতা কর্মীদের তিনি তো ঠিকই পেটাতে পেরেছিলেন কিন্তু মজুতদারদের উনি পেটাতে পারেননি। ফলে দেশের যে উৎপাদন ঘাটতি ছিলো তার ওপর বাইরে থেকে খাদ্য আসা কমে যাওয়ায় এবং মজুতদারদের খাদ্য গুদামজাত করার কারণেই ৭৪-এ দুর্ভীক্ষ দেখা দিয়েছিল।

হালখাতা

আমাদের দেশে এক দিকে দ্রব্যমূল্যর উর্ধ্বগতি, অন্যদিকে বিশ্বমন্দার প্রভাব। এই যে মালয়শিয়া, দুবাই, সিঙ্গাপুর, সৌদি ইত্যাদি দেশ থেকে হাজার হাজার শ্রমিক দেশে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে– সরকার সামনের এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে নিশ্চয়ই হিমশিম খাবে। সব মিলিয়ে আমাদের দেশ কি ৭৪-এর মত একটা পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে না?

বরুদ্দীন উমর

রাজার সিণ্ডিকেট এর একমাত্র উদ্দেশ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনার ভেতরে থাকবেই। এখানে নিয়ন্ত্রণ করছে কারা? এখানে দেখা যাচ্ছে যে রক্ষক সেই ভক্ষক। অন্যদিকে বিশ্বমন্দার কারণে আমাদের দেশের হাজার হাজার লোক যারা বিদেশে কাজ করছে তারা বেকার হয়ে দেশে ফিরছে এবং আরো ফিরবে। এতে করে দেশের ভিতরে একটি অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কথা হচ্ছে এরকম পরিস্থিতি তো অনেক দেশের ক্ষেত্রেই হবে। সেক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার ভেতরে প্রধান অসুবিধা যেটা সেটা হল খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে। একটি রাষ্ট্রে খাদ্য সঙ্কট অন্যান্য কারণেও দেখা দিতে পারে। খরা, বন্যা এসব কারণেও খাদ্যে বড় ধরনের ডিজাস্টার দেখা দিতে পারে। এসব পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে খাদ্য আমাদানী করতে হয়। ৭৪-এ আমেরিকা খাদ্য দেয়নি। কিন্তু খাদ্য তো অন্যান্য দেশেও ছিলো। সরকার সেখানে কতটা চেষ্টা করেছিলো? বার্মা ছিল, ইণ্ডিয়া ছিল, চায়না ছিল। এসব জায়গা থেকে তো খাদ্য আমাদানি করা যেতো। যাই হোক পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো বিশ্বমন্দার কারণেও হয়েতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সেটা বাঁচা-মরার সমস্যা।

হালখাতা

এই যে বললেন, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের জন্য মন্দা একটি বাঁচা-মরার সমস্যা; তো এক্ষেত্রে সমস্যাটি মোকাবেলা করার আপনি কী ধরনের পরমর্শ দেবেন?

বরুদ্দীন উমর

আমি তো আর দেশ চালাই না। দেশ যারা চালায় তারা কি আমার পরামর্শ শুনবে! কেউ পরামর্শ শুনলে না হয় তাকে পরামর্শ দেয়া যায়। যারা সিণ্ডিকেট তৈর করে সরকার তো তাদেরই সহযোগী মাত্র। আর বিদেশ থেকে ফেরত আসা শ্রমিকরা দেশে ফিরে কাজ পাবে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এতো মানুষকে এক সঙ্গে কাজ দেয়া সেটা একটি অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই সরকার যদি দেশের মানুষের কল্যান চায়,

সরকারকে এসব বিষয় মাথায় রেখেই সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেখানে আমার যা বলার থাকবে সেটা আমি খবরের কাগজে লিখে জানানোর চেষ্টা করবো।

হালখাতা

অমর্ত সেন তো বলেছিলেন, যেখানে স্বাধীন সংবাদপত্র রয়েছে সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে না। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

বদরুদ্দীন উমর

হ্যাঁ এ বিষয়ে তার একটা থিওরীও রয়েছে। এ বিষয়ে এখানে তার সঙ্গে আমার একটি বিতর্কও হয়েছিলো। আমি তার মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। অর্মত্য সেনের মতে যেখানে স্বাধীন সংবাদপত্র আছে সেখানে নাকি দুর্ভিক্ষ হবে না– উনি শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হন নি, ওনার মতে ভারত বর্ষের কোথাও নাকি দুর্ভিক্ষ নেই। অথচ পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে চীনে নাকি কোটি কোটি লোক দুর্ভিক্ষে মারা গেছে। তখন চীনে নাকি তিন কোটি লোক মারা গেছে যা কেউ শোনে নি। একটি দেশে তিন কোটি লোক মারা যাবে আর কেউ শুনবে না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তো আমেরিকার এম্বেসি কি করছিলো? তাদের এন্টায্যার গোয়েন্দা ব্যবস্থা কী করেছিলো? এ সমস্ত বিষয়ে অমর্ত্য সেনকে আমি ধরে ছিলাম। আমি বল্লাম, ইন্ডিয়াতে দুর্ভিক্ষ হয়নি এটা আপনাকে কে বলেছিলো? কালাহাটিতে, উরিষ্যাতে, মধ্য প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। আসামে মিজোরামে নেহেরুর সময় একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো। তো কথা হলো চীনে যে এতো দুর্ভিক্ষ, সেটা চীনের লোকেরাও জানলো না? অথচ সেটা অর্মত্য সেন কী করে জানলেন? এই পয়েন্টে ইন্ডিয়ার নানা প্রদেশের দুর্ভিক্ষের কথা তাকে বলাতে উনি আমাকে বললেন দুর্ভিক্ষ কিছু কিছু হয়েছে তবে ঐ পরিমাণ লোক মারা যায় নি। ওনার এই কথার জবাবে আমি বললাম আপনি এবার বলুন কত লোক মারা গেলে আপনি সন্তুষ্ট হতেন?

হালখাতা

এই যে অসামঞ্জস্যভাবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার তুলনায় পণ্যের মূল্য বেড়ে যায় এটা চূড়ান্তভাবে রোধ করার জন্য কী ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

বদরুদ্দীন উমর

মূল কথাটি হচ্ছে আমাদের এখানে যে ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সেটা হলো এখানে উৎপাদনটা হয় সমাজিকভাবে কিন্তু কারখানার মুনাফার মালিকানা সামাজিকভাবে হচ্ছে না। কিন্তু হওয়া দরকার যেটা, সেটা হলো উৎপাদন হবে সামাজিক একইভাবে মুনাফা সুবিধাটাও বন্টিত হবে সমাজিক উপায়ে। যেমন একটি গার্মেন্টস ফেক্টরিতে ধরা যাক

এক হাজার শ্রমিক কাজ করে– তাহলে দেখা যাচ্ছে সমাজের এক হাজার জন মানুষ এখানে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। অর্থাৎ এখানে উৎপানদটা হচ্ছে সামাজিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু এই কারখানার যা অর্জন অর্থাৎ মুনাফার মালিক হচ্ছে একজন, দুইজন বা পাঁচজন ব্যক্তি। অর্থাৎ কারখানার এই মুনাফার ভাগিদার এক হাজার জন লোক হচ্ছে না। সমস্যাটা এখানেই।

স্বভাবিকভাবেই এখানে যে বিষম্য তৈরি হচ্ছে তার দীর্ঘমেয়াদী একটি ভীষণরকম খারাপ প্রভাব রয়েছে। কাজেই যে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে এই ধরণের অসামঞ্জস্য পদ্ধতি ক্রিয়াশীল থাকবে সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে একটি ভারসাম্যহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবেই।

হালখাতা

আপনি একটু আগে বললেন, গ্রামে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বর্তমানে সন্তোষজনক অবস্থায় আছে। আবার বললেন, দেশে নিরব দুর্ভিক্ষ চলছে। কথা হলো দেশের আশি শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে; সেই গ্রামেই যদি শ্রমিকের পারিশ্রমিক সন্তোষজনক অবস্থায় থাকে তাহলে আপনি নিরব দুর্ভিক্ষের কথা বললেন কেন? কথা দুটি কি পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল না?

বদরুদ্দীন উমর

ধরা যাক ঢাকা শহরের ফুটপাতে যারা নানারকম এটা সেটা নিয়ে দোকান দিয়ে বসে, তাদের আয় রাজগার খুবই কম হয়। তার ওপর পুলিশকে টাকা দিতে হয়, পুলিশের ধাওয়া খেয়ে উঠে যাওয়ার সময় অনেক পণ খোয়া যায় ইত্যাদি। আবার আদমজীর মতো বহু মিল বন্ধ হয়ে গেছে, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষের জীবন-জীবীকা জড়িত ছিল। এগুলো এক ধরণের চিত্র। আবার গ্রামে ইরিগ্রেশন বা অন্যান্য কারণে ফসলের উৎপাদন বেড়েছে কিংবা শহরে গার্মেন্টসে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে কিংবা ইপিজেড-এর মতো শিল্প এলাকা হয়েছে ইত্যাদি– এগুলো ভিন্নরকম চিত্র। কথা হলো এই দুই ধরনের চিত্রের মধ্যে এক ধরণের পার্থক্য হয়ত চোখে পড়ছে। কিন্তু একজন কৃষক বা একজন গার্মেন্টস শ্রমিক যে মায়না পাচ্ছে, সেটা দিয়ে কি সে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারছে? অবশ্যই পারছে না। অথচ জমির উৎপাদিত ফসলের পুরোটা ভোগ করছে জমির মালিক একইভাবে কারখানার মুনাফার পুরোটা নিয়ে নিচ্ছে কারখানার মালিক। কথা হলো গ্রামের কৃষকারা পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় মজুরি বেশি পাচ্ছে ঠিকই, তার মানে এই নয় যে তাতে তাদের ক্রয়-ক্ষমতা বেড়েছে, যে জন্য তারা যা খেতে পারছে সেটা তাদের শরীরে জন্য যথেষ্ট নয়; অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে পারে না যে জন্য তারা ঐ কবরে মরে না গিয়ে ধুকে ধুকে মরছে। সুতরাং এটা নিরব দুর্ভিক্ষ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

হালখাতা

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভোগ্যপন্যের দাম কিছুটা কমেছে, যা গত চার দলীয় সরকার বা আর্মি নিয়ন্ত্রিত তত্বাবধায়ক সরকার আমলে সম্ভব হয়নি। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

বদরুদ্দীন উমর

ভোগ্যপন্যের মূল্য কিছুটা কমেছে এতে মহাজোট সরকারের কৃতিত্ব নেই, কারণ আন্তর্জাতিক বাজারেই এসব পন্যের মূল্য অনেক কমেছে। বিশ্ব বাজারে যে হারে তেল, স্টিল ইত্যাদির দাম কমেছে এবং তার যে প্রভাব আমাদের বাজারে পড়ার কথা সে-অনুসারে পন্যের দাম কমানো হয়নি। আর বিশ্বের এই অবস্থায় যে সরকারই থাকত পন্যমূল্য কিছুটা এমনিতেই কমে আসত। তবে বিশ্বমন্দার কারণে যে চাপ আসছে সেটা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে মহাজোট সরকারের শক্তি কতটা আছে সেটা বোঝা যাবে।

হালখাতা

বিশ্বমন্দার কারণ হিসেবে বিশ্বপুঁজিবাদের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়াকে শনাক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। যে ধ্বসের জন্য অসংখ্য মানুষ খোদ আমেরিকাতেই বেকার হয়ে পড়ছে। ঋণের বোঝা না বইতে পেরে অনেকেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা হয়ে পড়ছে বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ। একই সমস্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। আপনার কি মনে হয় পুঁজিবাদের চরম এই দুর্দশা পৃথিবরি মানুষকে আবার সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাবে?

বদরুদ্দীন উমর

এটা তো বিজ্ঞান যে, বিশ্ব অর্থনীতি একটা ফাঁপা বেলুনের মতো ভিত্তিহীনভাবে ফুলতে ফুলতে এখন সেটা ফেটে গিয়েছে। পুঁজিবাদ বিশ্বে যে ইমব্যালেন্সড একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে, সেটা তো এক সময় ভেঙ্গে পড়বেই। হয়েছেও তা-ই। আর পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত পুঁজিবাদের বাইরে সমাজতন্ত্র ছাড়া কী-ই-বা পথ খোলা আছে? পৃথিবী আজ তৈরি হয়ে আছে, বাংলাদেশ তৈরি হয়ে আছে– হয়ত সঠিক নেতৃত্ব পেলে এই মুহূর্তেই ঘটে যেতে পারে, যেটা তোমরা বল্লে। বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে সেটা ঘটছে, এভাবেই হতে হতে দেশব্যাপি মানুষ জেগে উঠবে এ-ব্যপারে আমার সন্দেহ নেই।

হালখাতা

কানসাট, ফুলবাড়ি, গার্মেন্টস শ্রমিক, আনসার ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ধরনের বিদ্রোহ হয়েছে ইদানিংকার ঘটে যাওয়া বিডিয়ার বিদ্রোহ কি তারই ধারাবাহিকতা? বিডিয়ার বিদ্রোহে এতজন অফিসার মারা গেলেন, বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

বদরুদ্দীন উমর

এব্যাপারে আমরা একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছি। সেখানে আমাদের কথা বিশদ ও পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করেছি। কথা হলো বিডিয়ারের জোয়ানদের মধ্যে বঞ্চনার ক্ষোভ ছিল এবং সেটা অতি তিব্র একটা অবস্থান নিয়েই ছিল। তা সত্বেও এতগুলো মানুষ হত্যা করা বিশেষ পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব না। কাজে কাজেই বিডিয়ার জোয়ানদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি। তারা এখানে এনার্কি সৃষ্টি করতে চায়। যেটা তারা করেছে পাকিস্তানে, ইন্ডিয়াতে। সেজন্য আমরা বিডিয়ারে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান চেয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দলনের ডাক দিয়েছি। শিঘ্রই এনিয়ে আমরা জাতীয় কনভেনশন করতে যাচ্ছি।

হালখাতা

হালখাতা-কে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বদরুদ্দীন উমর

ধন্যবাদ হালখাতা-কেও।

দ্রব্যমূল্য কমেনা কেন বাংলাদেশে–কেন মন্দা বিশ্বে

আ বী র হা সা ন

জিনিসপত্রের দাম কমেই না, মোটেও কমেনা তা বলব না, অর্থাৎ যতটা মানুষ চায় ততটা কমে না। যে গতিতে দ্রব্যমূল্য বেড়েছিল তার দশ ভাগের একভাগ গতিতে কমে– তাও যেন ঠেকে গেছে এক জায়গায় এসে। দাম বাড়ার এবং তা না কমার নানা রকম কারণের কথা শোনা যায়– বিশেষজ্ঞরা বলেন, অর্থনীতিবিদরা নানাভাবে এ কথাটি বলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা হয় সিণ্ডিকেটের কথা, মৃদু স্বরে বলা হয় মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়মে প্রতিযোগিতা না থাকার কথা এবং মজুতদারীর কথা। সাধারণ মানুষ বলে সরকারের হস্তক্ষেপ না করার কথা। ব্যবসায়ীদের দিক থেকে আমদানী নির্ভর পণ্যের ক্ষেত্রে বলা হয় বিশ্ব বাজারের চড়া মূল্যের কথা, দেশের অভ্যন্তরে পরিবহন ব্যয়ের কথা। কৃষকের কথা কিংবা কৃষিপণ্যের পাইকারদের কথা খুব একটা শোনা হয় না, কৃষকের অনুরূপ শোনা যায় অল্প-স্বল্প, ন্যায্য মূল্যে না পাওয়ার কথা বলে সাধারণ কাঁচা পণ্যের আড়ৎদাররা বলে সংগ্রহ করতে বেশি মূল্য দেওয়া এবং পরিবহন ব্যয়ের কথা। খুচরো বিক্রেতারা দোহাই দেয় 'কোম্পানির', নয়ত পাইকারী বাজারের আড়ৎদারদের চাঁদাবাজির কথাও বলে তারা মাঝে মাঝে। কিন্তু তারপরেও হিসেব মেলেনা। কারখানা বা বন্দর কিংবা কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকা থেকে পাইকারি বাজার আড়ৎ পর্যন্ত হিসাবটাকে যৌক্তিক মনে হলেও খুচরা বাজারের হিসাবটাকে যৌক্তিক মনে হয় না। তার পরেও খুচরা বিক্রেতাদের 'অতিমুনাফা' তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে এখনও দেখা যায়না। অনুযোগ তারাও করে এত দামের বাজারে চলতে পারছেনা বলে।

বিশ্বব্যাপী মন্দার এভাবে এমনটা হয়েছে? শিরোনামটা দেখে কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন 'গায়ের জোরেই আমি দুটো ব্যাপারের মধ্যে সম্পর্ক টানতে যাব'। (মোটা দাগে ওটা করতে যাওয়ার আগে আমার মনে পড়বে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য যখন বাড়া শুরু করেছিল তখন বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা লাগেনি বরং বেশ তেজি ভাবই ছিল, আবার মন্দার এভাবে এখন যখন বিশ্ব বাজারে অনেক চড়েই আছে)। সম্পর্ক একটা আছে, তবে সেটা সরাসরি প্রভাবের নয়– স্বভাবগত কার্যকারণের। পরে আসছি সে কথায়, তার আগে বাংলাদেশের বাজারটাকে দেখা যাক– ১. বাংলাদেশের খোলা বাজারের প্রবনতা দেখে যারা বিস্মিত হচ্ছেন, তাদের জ্ঞাতব্যে বলে রাখতে চাই,

এদেশের কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং বিপনন ব্যবস্থা দশ বছর আগের মতো নেই। এটা খুব বেশি মাত্রায় সাম্যবাদী থেকে পুঁজিবাদী হয়ে উঠেছে তা বলব না, কারণ পুঁজিবাদ আগেও ছিল এখনও আছে তবে পুঁজিবাদের ঘৃন্য ব্যাপার আর মুক্তবাজারের অশুভ প্রবনতাকে সঙ্গে করে এটা এগুচ্ছে। কৃষিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় খানিকটা পরিবর্তন এসেছে এবং কৃষিপণ্য বিপননের প্রক্রিয়াতেও উল্লেখযোগ্য রদবদল হতে দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য পুঁজিবাদী উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশের মতো উৎপাদিত কৃষিপন্যের প্রকৃত মূল্য স্বাভাবিক নিয়মে হিসাব করা হচ্ছে না, মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়া এবং সর্বশেষ বিপনন ক্ষেত্রেও হিসাবটা সরল নেই– বরং বেশ জটিল হয়ে গেছে।

একারণেই আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সরকার এসেই সারে ভর্তুকী আর জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা হলেও কমিয়েও অন্যান্য দ্রব্যমূল্য উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে পারেনি। যে অর্থনীতিবিদরা আগে বলেছিলেন সার আর জ্বালানি তেলের দাম কমিয়ে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে দ্রব্যমূল্য কমানো যাবে তাঁরা অতি সরলভাবে হিসাবটা করেছিলেন, তারা দেখেননি উৎপাদনের হাল হাতিয়ারের চরিত্র বদল এবং উৎপাদন ও সর্বশেষ বাজারের মধ্যকার "লগ্নী পুঁজির" প্রতিক্রিয়াটাকে। আগে একটা সরস হিসাব ছিল যে কৃষক উৎপাদন করে সে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয়, ফসল দিয়ে যা শোধ করে সে,উৎপাদিত পণ্য সে বিক্রি করে মধ্যস্বত্ব ভোগীর কাছে 'ব্যাপারীর' নামে পরিচিত ছিল যারা, তারা যেই পণ্য নিয়ে আসে আড়তে, আড়ত থেকে পণ্য কিনে নিয়ে যায় খুচরা বাজারে বিপননকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা, এই ছক বা মূল্যটাকে মনে রেখে হিসাব করলে বাংলাদেশে এরা কেজি প্রতি চালের উৎপাদন ব্যয় ৭ টকার বেশি হওয়ার কথা নয় কিন্তু বাস্তবে সেই ব্যয় হচ্ছে ১১ টাকার ওপরে। এ ছাড়া আগে ভ্যালু এ্যাডিশন যেটা কৃষক করত, সেটা এখন আর কৃষক করেই না, ফলে চালের ক্ষেত্রে পাইকারকে কিনতে হয় ১৩-১৪ টাকায়, সেটা আড়তে পৌঁছালে হয়ে যায় ১৭-১৮ টাকায় ওপরে। খুচরা বাজারে সে মূল্য থেকে ৮ থেকে ১০ টাকা বেশি দরে বিক্রি হয়– কিন্তু কেন?

এ পশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ার কারণগুলো এবং অন্যান্য মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোয় লগ্নী পুঁজির প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারগুলোও দেখা জরুরি। আসলে বাংলাদেশের কৃষিটা আর আগের মতো নেই। উৎপাদনের হাল হাতিয়ারের অনেকটাই আর প্রকৃত কৃষকের কাছে নেই। নিজের গরু আর লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে রক্ষিত বীজ দিয়ে ধান বোনার মতো সরল প্রক্রিয়াটা আর নেই, এখন গরু দিয়ে লাঙ্গল চষে খুব কম কৃষকেই, তার বদলে তারা ভাড়া করে পাওয়ার টিলার, যার মালিক অন্য লোক। একই ব্যাপার দেখা যায় সেচের ক্ষেত্রেও কাগজেপত্রে সেচ পাম্প কৃষক সমবায়ের হাতে থাকলেও বাস্তবে তা নেই। বেশির ভাগই গ্রাম্য টাউট, সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেছে পাওয়ার টিলার আর সেচ পাম্পের মালিকানা। ফলে কৃষককে এগুলো ব্যবহার করতে বেশ টাকা খরচ করতে হয়, যেমন টাকা খরচ করতে

হয় উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজের জন্য; সারের জন্য; সেচের জন্য। এ টাকা আসে কোথা থেকে? প্রাচীন মহাজনী প্রথা কোথাও কোথাও থাকলেও বেশিরভাগ কৃষকই এখন ক্ষুদ্র ঋণের জালে আটকা পড়ে গেছে। বেসরকারী ঋণ দানকারী সংস্থাগুলোর পাশাপাশি এখন সরকারী ব্যাংকগুলোও উচ্চ সুদে ক্ষুদ্র ঋণ দিচ্ছে, যা বিশ্ব পুঁজিবাদের নির্ধারিত সুদরে হারের চাইতে চারগুণ বেশি । অধিকাংশ কৃষকই সাধারণ ঋণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণও নেয় আর এই উচ্চ সুদটা সে পরিশোধ করে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করেই। ফলে সরল হিসাবে উৎপাদন ব্যয় যা থাকে বাস্তবে প্রকৃত ব্যয় হয়ে যায় তার চাইতে অনেক বেশি। এরপর কৃষক আর আগের মতো হাটে গিয়ে সরাসরি ব্যাপারী বা আড়ৎদারের কাছে ধান বা চাল বিক্রি করে না। যে ধান বিক্রি করে দেয় স্থানীয় চাতাল মালিকদের কাছে। গ্রামীণ ওইসব চাতাল মালিকরাও পুঁজির জন্য সরণাপন্ন হয় ব্যাংক কিংবা ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলোর। এখানেও উচ্চ সুদ উসুল হয় পণ্য বিক্রির দামের ওপর বেশ খানিকটা বেমি দাম ধরেই। এই ভ্যালু এ্যাডিশন বা ধান থেকে চাল উৎপাদনের ওপর আবার আছে ভি এ টি বা ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স। ফলে বাজারে যে চালটা আসে সেটার দাম কৃষকের উৎপাদন মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ৫০ শতাংশও দাঁড়িয়ে যায়।

আবার চাতাল মালিকরাই যে সরাসরি পাইকারে সরবারাহ কারীদের কাছে চাল বিক্রি করে দেয় তাও না। এখন প্রতি জেলায় বিশেষ করে নিবিড় উৎপাদন এলাকাগুলোর এক ধরনের অননুমোদিত মজুতদারের দেখা মিলছে, উৎপাদন মৌসুমে এরা কম দামে চাল কিনে ছোট ছোট গুদামে বা বাড়িতে মজুদ করে রাখে; এদের প্রকৃত সংখ্যাটাও সরকারের খাতায় নেই, এই চাল কেনার সময় এরাও নিজেদের ক্ষুদ্র পুঁজির সঙ্গে যোগ করে ক্ষুদ্র ঋণ। ফলে এরা যখন এক মাস থেকে তিন মাসের মাথায় মজুদ চাল বিক্রি করে নেয় তখন তারা সেই সুদ উসুল করেই দাম ধরে। (মাঝে মাঝে এরা বিক্রিও করে না, স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশি সময় ধরে রাখে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানোর জন্য; যেটা চরম আকার ধারণ করেছিল ২০০৭ সালে। এর পরেই মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের পালা সরবরাহকারীদের পালা। এদের জন্য সমস্যা হলো পরিবহন ব্যয়। আসলে সমস্যাটা তারা নিজেদের ঘাড়ে রাখে না, বাকিয়ে দেয় পণ্যের ওপর। জ্বালানি তেলের মূল্যের জন্যই পণ্যমূল্য বাড়ে তা নয়, ব্রিজ-সড়কের টোল, চাঁদাবাজি ইত্যাদির কারণেও দাম বাড়ে। এছাড়া বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ট্রাকের লোড ব্যাপাসিটি নিয়ন্ত্রণ করার কারণেও দাম বেড়েছিল চাল এবং অন্যান্য পণ্যের। কারণ আগে যেখানে একটি ৫ টনের ট্রাক ৮-৯ টন পণ্য পরিবহন করত সেখানে নিয়ম মাফিক ৫ টনই পরিবহন করার নিয়ম করা হয়; একদিকে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, ট্রাকের ভাড়া বৃদ্ধি তার সঙ্গে লোড ব্যাপাসিটি বিধানের ফলে চালসহ অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের দামের ওপরে বড় ধরনের চাপ পড়ে। ফলে দেখা যায় রাজধানীসহ

শহরাঞ্চলগুলোর চাল যখন আড়তে পৌঁছায় তখন সেটা উৎপাদন মূল্যের দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়। এর পর যায় খুচরা বিক্রেতার হাতে।

এভাবেই দাম বাড়ে; প্রবন্ধের সেই প্রথম দিকের প্রশ্নের উত্তর এখানে পাওয়া যাবে। আজকাল শহরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও বেশিরভাগই ক্ষুদ্র ঋণের শৃঙ্খলের মধ্যে এসে পড়ে গেছে। জামানত ছাড়া ঋণ পাওয়া যায় বলে, উচ্চ মূল্যের বাজার থেকে বেশি পরিমাণ পণ্যকিনার জন্য তারা একাধিক সংস্থার কাছ থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নেয়, এ ঋণের সুদ তাদের দিতে হয় সপ্তাহিক কিস্তিতে, এটা একটা বাড়তি ব্যয়ের চাপ হিসেবেই তারা দেখে এবং আড়ৎ থেকে কিনে আনা পণ্যের দামের ওপর হিসেব কষে ওই বাড়তি ব্যয়টা উসুল করার চেষ্টা করে তারা। ভোক্তা বেশি দাম দিয়ে পণ্য কিনতে বাধ্য হয় কিন্তু ওইসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রি করে বেশি লাভ হলেও তা তারা কাছে রাখতে পারে না, সুদের কিস্তি দিতে তার সিংহভাগ ব্যয় করতে হয় তাদের।

কাজেই সরলভাবে হিসাব কষে কৃষি উপকরণের দাম কমিয়ে চাল-গমের দাম কমানো যাবে না। দাম কমাতে হলে ভাঙতে হবে উচ্চ সুদের ঋণের শৃঙ্খল। এছাড়া হাল-হাতিয়ারের মালিকানা বিশেষত জমি চষার কলের লাঙল (পাওয়ার টিলার) আর সেচ যন্ত্রের ব্যবসা টাউট সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। করা তত সহজ নয় কারণ এর সঙ্গে রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির সংস্রব আছে। এছাড়া বীজ-কীটনাশক ইত্যাদির ব্যবসা, সারের ডিলারশিপ এর সঙ্গে এনজিও এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের সংস্রব এত প্রবল যে কৃষক স্থানীয়ভাবে এদের কবল থেকে পরিত্রানের উপায় জানে না। পুঁজিবাদের সরল নিয়ম এখানে কাজ করে না, রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ (বামপন্থী নয়) সেচ যন্ত্রের সুবাদে খোলাখুলিভাবে প্রশাসনের সহযোগীয়তায় বা প্রশাসনকে জিম্মি করে (কিছু দিন আগে পাবনায় সেচ সন্ত্রাসীরা স্থানীয় এক ইউএনওর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল তিনি কৃষকদের ওপর তাদের প্রতিবাদ করায়) অবৈধ উপার্জন করে। এছাড়া অননুমোদিত 'রাখি মালের' ব্যবসা বা স্থানীয় পর্যায়ে গুদামজাত করায় যে সমস্যা সেটাও করে এই শক্তিধর রাজনীতির স্থানীয় নেতা-কর্মীরাই। এদর কারণে কেবল চাল-গম নয়, ডাল পিয়াজ, রশুন শুকনামরিচ, ইত্যাদি পণ্যের দামও চড়ে যায়।

সে কারণে দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলা যায়, দ্রব্যমূল্য কেবল কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতার ওপরই নির্ভরশীল নয়। বাংলাদেশে "ক্ষুদ্র ঋণের উচ্চ সুদ" আর "রাজনৈতিক সন্ত্রাসের" ওপরই বরং বেশি নির্ভরশীল। পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্লাসি ক্যাল নিয়মের বাইরে বয়ে গেছে। এগুলো ঋণ পুঁজিবাদের বৈধ নিয়ম হলেও সুদের হারের একটা সর্বজন গ্রাহ্য সীমা আছে ক্ষুদ্র ঋণ সেই সীমা অতিক্রম করেছে এবং তা অনুমোদিত (যা সহজনীয়) সুদের হারের বারগুণ উসুল করছে তাও সাপ্তাহিক কিস্তিতে। ফলে উৎপাদক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উভয়ের উপায়ে থাকছে না পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে উসুল করা ছাড়া আর এই বেশি মূল্যটা চলে যাচ্ছে সুদের কারবারিদের কাছে। পণ্যমূল্য বাড়িয়ে কৃষক বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কেউই উপকৃত

হচ্ছে না– উপকৃত হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ দাতা, বাংক ও সংস্থাগুলো। অত্যধিক সুদ আসলে খেয়ে ফেলছে পুঁজিবাদকেও। এছাড়া আছে ইসলামিক ব্যাংকিংসহ মোট চার ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেগুলো অতি মুনাফার বাণিজ্য করছে।

এজন্যই এখন দেখা যাচ্ছে মধ্য আয় ও নিচু আয়ের ব্যক্তিদের বাজারে খুব একটা ভোগবাদী প্রবনতা নেই, প্রয়োজনীয় পণ্য ছাড়া বিলাস পণ্যের বাজার সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, পুঁজি একে জমা হচ্ছে সুদের ব্যবসায়ীর কাছে এবং মৌলবাদী ধর্মব্যবসায়ীদের কাছে। এরা বাজারে একটা ভারসাসাম্যহীনতা তৈরি করেছে এবং তাদের অনিয়মটাকে নিয়মে পরিণত করার চেষ্টা করছে। ১/১১-র সুযোগে আসলে এরাই ক্ষমতা দখল করেছিল। তাদের সময়ে রাজনৈতিক সংস্কারে দুর্নীতি দমন বা দ্রব্যমূল্যে রোধ না হলেও তাদের অনুকূলে বাংকিং আইন ও আর্থিক খাতে সংস্কার ঠিকই হয়েছে। উচ্চ সুদের সাম্যবাদী মহাজনী ব্যবসাকে এরা আধুনিক পুঁজিবাদী বাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে এবং এ ধরনের ঋণ দেশী বিদেশী সব ব্যাংকের জন্য 'বাধ্যতামূলক' করা হয়েছে। বৃদ্ধি করেছে ক্ষুদ্র ঋণের সীমা এবং চালু করেছে 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ' ঋণ। এই সব ঋণের বিস্তৃতি দেশে সুস্থ বিনিয়োগে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি।

আজকে বিশ্বের অন্যান্য পুঁজিবাদী, উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশে তারা 'ক্ষুদ্র ঋণ' প্রচলন করছে না কেন? কারণ তারা জানে এটা পুঁজিবাদী বাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। চালু করলে আর্থিক খাতে যেমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তেমনি বাজারেও তার প্রভাব পড়বে। এছাড়া সাধারণ ব্যাংকিং-এর ১৪-১৫ শতাংশ সুদের ঋণের ক্ষেত্রে বিরুপ প্রভাব ফেলছে বিশ্ব পুঁজিবাদ মানে করছে। কারণ এমনিতেই বিশ্ব পুঁজিবাদ মন্দার প্রকোপে পড়েছে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সঙ্গে বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য না কমার স্বভাবগত আসলে ঋণের উচ্চ হার সুদ। এছাড়া আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন আমদানী নির্ভর পণ্যগুলোর প্রতিও। জ্বালানি তেলের ব্যবসাটা করে সরকার। এবং এক্ষেত্রে সরকারেরই রয়েছে ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ড দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থাৎ বিশ্ববাজারে দাম কমলেও 'চোরাচালান' হয়ে যাবে এই ভয়ে দাম কামানো হচ্ছে না। প্রশ্ন হল জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় তাহলে এত সীমান্তরক্ষী কেন? জ্বালানি তেলের দাম যখন ১০০ ডলারে দাঁড়িয়ে ছিল তখন যে দাম বৃদ্ধি হয়েছিল এখন ৪০ ডলারের তেলের ক্ষেত্রে দু'দফায় মাত্র ৪ টাকা কামনো হয়েছে লিটার প্রতি। আসলে কৃষিপণ্য, শিল্প পণ্য তা আমদানী করা সব ক্ষেত্রেই পরিবহন ব্যয়ের একটা ভূমিকা আছে। এটা উল্লেখযোগ্য হারে না কমালে দ্রব্যমূল্যও উল্লেখযোগ্য হারে কমবে না। সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে হবে প্রধান খাদ্যশস্য ছাড়াও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের সহজ প্রাপ্তির ব্যাপারে। এক্ষেত্রে আমদানি প্রতিযোগিতামূলক করা, প্রক্রিয়াজাত করণে শুল্ক হার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাজস্ব আয় বাড়াতে গিয়ে উচ্চাভিলাসী শুল্কহার ভারসাম্য

নষ্ট করছে বাজারের। দরিদ্র দেশে উন্নত দেশের চেয়ে বেশি মাত্রায় শুল্ক নির্ধারণ অদূরদর্শীতারই নামান্তর। কারণ এর প্রতিক্রিয়া আমদানী কমে যেতে দেখা যাচ্ছে–। বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের মূল্য কমলেও দেশে বাড়তি মূল্যে সেগুলো কিনতে হচ্ছে দরিদ্র জনসধারণকেই। এখানে তাই এখন কেবল প্রধান খাদ্য শস্যের দাম কমানোর চেষ্টা করলেও আর্থিকভাবে বাজার সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসবে না। এটা করতে হলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, রাজস্বনীতি, সরকারের নিজস্ব বাণিজ্য, আমদানী ও প্রক্রিয়াজাত করণে প্রতিযোগিতার অভাবের বিষয়গুলোকে পর্যালোচনা করতে হবে। কাজটা খুব একটা কঠিন যে তাও নয়; ২০০৩ সালের পরিস্থিতি ও সেই মানটাকে সামনে রেখে তুলনামূলক বিচার করলেই একটা যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তো আমাদের নেই, কাজেই পুঁজিবাদী ধারার রাষ্ট্রও চালাতে হলে পুঁজিবাদের মূল শর্তগুলোকে অনুসরণ করতে হবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি হচ্ছে উৎপাদক এবং ভোক্তা, ফিন্যান্স বা ক্যাপিটালের মালিক নয়। কিন্তু রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে গত দশ বছরে ফিন্যান্স পুঁজির মালিকরা এখানে প্রধান কর্তা হয়ে বসেছে, অপ্রচলিত এবং বিকল্প ধারায় বাংকিং তথা অতি সুদের ব্যবসা অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হওয়ায় গণমানুষের অস্তিত্ব লুঠন করা হয়েছে। "সেনা-সুশীল" শাসনামলে এই অনিয়মকে দেওয়া হয়েছে নীতিগত বৈধতা। পুঁজিবাদে আসলে স্বার্থ দেখতে হয় শিল্প-পুঁজির মালিক এবং ভোক্তা সাধারণের। কিন্তু বাংলাদেশে এ দু'পক্ষ-কে বিবেচনায় না-রেখে কেবল সন্তুষ্ট রাখা হয়েছে অবৈধ ফিন্যান্স পুঁজির মালিকদের। রাষ্ট্রকেও জোর করে চালানো হচ্ছে ঐ পথে; মুদ্রা ব্যবস্থা, শুল্কায়ন, বিনিয়োগ নীতি, ভোগ্য পণ্য উৎপাদন অনুকূল নয় মোটেই (গার্মেন্টস শিল্পকে বেশি সুবিধা দিতে গিয়ে অন্য উৎপাদকদের প্রতিনিয়ত বঞ্চিত করা হচ্ছে এমনকি বিদ্যুতের মতো ভিত্তিমূলক খাতকেও), বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনা থাকলেও তা আসে না এ কারণেই। অবৈধ বাংকিং খাতের ফিন্যান্স পুঁজিকে সুবিধা দিতে গিয়েই কৃষিকরা হয়েছে মুখোমুখী এ সঙ্কটের। দ্রব্যমূল্য না কমা এর একটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া মাত্র। আরও ভয়াবহ সঙ্কট অপেক্ষা করছে– যার দরুণ বিদ্যমান শিল্পগুলোও ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। বিশ্বমন্দার প্রভাব যদি ন্যূনতমও পড়ে তাহলেও তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের থাকবে না। এটা ভয় দেখানো নয়, বাস্তব অবস্থাটাই এমন যে অনুৎপাদনশীল খাতে (বহুতল ভবন, গাড়ি, রিক্সা-ভ্যান ঋণ-প্রবাহ এত বেশি বাড়ানো হয়েছে এবং বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে (যেমন এস এম ই খাতে) যে তা প্রকারান্তরে গলার ফাঁস হয়ে দেখা দেবে। কারণ পুঁজিবাদ এমনই এক ব্যবস্থা যে ক্ষুদ্রতাকে দলে-পিষে শেষ করে দেয়।

দুই.

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেখানে উপনীত হয়েছি, সেই পুঁজিবাদের সঙ্কটই এখন প্রবল হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী। যে ধাপকে আমরা বলছি মন্দা। পুঁজিবাদের এই সঙ্কটটা কি অনিবার্য ছিল? এ পশ্নের উত্তরে বলা যায়– অনেকটাই অনিবার্য ছিল। কারণ শিল্প বিপ্লবের পর থেকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলো মাঝে মাঝেই এ ধরনের সঙ্কটে পড়েছে। পুঁজিবাদ অনেকটা এ কারণেই তাদের রাষ্ট্রগুলোকে গণতান্ত্রিক করতে চেয়েছে– যাতে শিল্প পুঁজিকে এবং ভোক্তা সাধারণকে সময়মত বা সঙ্কটকালে সহায়তা দিতে পারে। অতীতের রাজতন্ত্র ভদ্র ছিল মূলত সামন্ততন্ত্রের সহায়ক উপনিবেশিক কালে পুঁজির সমন্বয় এবং শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে প্রায়ই ব্যর্থ হতো। ভোক্তা সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখার বদলে নির্যাতন করে পুরনো প্রথায় অবদন করতে চাইত। আর অতিরিক্ত নির্ভরশীল থাকত ফিন্যান্স পুঁজির মালিকদের ওপর । শিল্প পুঁজির মালিকরা এই অবস্থাটা সহ্য করতে পারেনি। তাদের একদিকে প্রয়োজন ছিল শিল্প-কাঁচামালের সরবরাহ (উপাদানগুলো থেকে) স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার ভোক্তা এবং আন্দোলনহীন শ্রমিক। মূলত শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে রাখতে তারা। এজন্য বাংকিং ব্যবস্থাকেও তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে রাখত কর্তৃত্বকারী হিসেবে নয়। .... স্বরূপটা বোঝানোর জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। দেখা গেছে বাংকিং কর্মব্যস্ত বেশিমাত্রায় নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠাতেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা শুরু হয় বাড়ি ও ফ্ল্যাটের জন্য ঋণ দেওয়া এবং গাড়ির জন্য ঋণ দেওয়া থেকে। উচ্চ সুদের এই ঋণ অনেকেই পরিশোধ করতে পারেনি অন্যদিকে প্রাথমিক রাসায়নিক বাংকগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ব্যাংক কর্তারা উচ্চ বেতন নেওয়া শুরু করেছিলেন, বোনাস নিয়েছেন উচ্চ মাত্রায় আর অন্যদিকে অন্য প্রধান শিল্পগুলো যেমন গাড়ি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, রাসায়নিক, বস্ত্র, খাদ্য– এই খাতগুলো পড়েছিল প্রতিযোগিতায়। নতুন শতাব্দীর শুরুতে বিশেষ করে বিভিন্ন শিল্প যখন কোনো মতে অস্তিত্ব রক্ষায় শেষ চেষ্টা করে হাতরাচ্ছিল বাংকগুলো নিজেদের মতো করে নিজেদের বাণিজ্য কাজ করত। প্রতিযোগিতার মুখে শিল্প-বাণিজ্যে যখন ছাটাই শুর হল তখন অনেকেই ব্যাংকগুলোর উচ্চ সুদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা হারিয়েছিল; ফ্রান্সে-বাড়িগুলো নিলামে তোলার চেষ্টা করা হল কিন্তু কিনবে কে? সবাই তখন হুঁশিয়ার হতে শুরু করেছে; এভাবে বলতে বলতে বছর ছয়েকের মধ্যে শিল্পগুলোকে ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা হারালো বাংকগুলো এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও হয়ে পড়ল অসম্ভব। শেয়ার বাজারে শিল্পোদ্যোগ এবং ব্যাংক উভয়েরই দরপতন ঘটল। শুর হল মন্দা।

অর্থনীতিবিদ বাজার বিশ্লেষক সবাই হিসাব নিকেশ করে দেখলেন ব্যাংকগুলোর অদূরদর্শী দক্ষতা– উচ্চ সুদে ঋণ দেয়া, অপচয়, বিলাসীতা ইত্যাদি তারা শিল্প সহায়ক সীমাবদ্ধ ব্যবসা করতে না গিয়ে নিজেদের মতো সাধারণ ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবসা করতে

গিয়ে পুঁজি খুইয়ে বসেছে। ভোক্তাদের অনেকেই চাকরি হারিয়েছে, ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো গুটিয়ে গেছে বড় ব্যবসাগুলোও বিশ্ববাজারে অসম প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে পারে নি। কারণ যে পণ্য ও ব্যবসা কিংবা শতাব্দীর শেষ দশক থেকে রমরমা হয়ে উঠেছিল তা অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য ছিলনা। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য অনিশ্চয়তায় ভোক্তা আগে থেকেই পিছটান দেওয়া শুরু করেছিল। যেমন– মূল আইসিসি খাতে প্রচেষ্টা আগেই লেগেছিল, পরে লাগল মোবাইল সার্ভিস খাতে, গাড়ি. এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যাংকগুলো কিন্তু এ পরিস্থিতির তোয়াক্কা করেনি, অনেক সরকার আর্থিক সংস্কার ঘটিয়ে বরং ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। ক্রেডিট দিতে নতুন ব্যাংককে বাধা দেয়নি তারা। ফলে আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল– সেটা এখনও চলছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আর শিল্প সহায়ক থাকেনি পুঁজিবাদের শর্ত মোতাবেক। পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা তাই বলেছেন বাংকগুলোর উচ্চ সুদের অতিমুনাফা।

বার বার আগে যে সব মন্দা হয়েছে সেগুলোর এর চরিত্র একটু ভিন্নতর কারণ আগে দেখা গেছে কোনো একটা শিল্পে অতিমাত্রায় বিনিয়োগ করতে গিয়ে মন্দা দেখা দিয়েছে যেমন ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে যখন রেল লাইন বসানো হয় তখন মন্দা দেখা দিয়েছিল। সে সময় থেকেই মূলত: এটা নতুন কিছু নয়। যাঁরা মনে করেন এটা জাতীয়করণ তাঁরা আসলে ভুল করেছেন। পুঁজিবাদে সরকারের ভূমিকাই হল পুঁজিবাদকে রক্ষণ করা এবং তা শিল্পগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেই করতে হয়। শিল্পোদ্যক্তা আর সাধারণ ভোক্তাদের ট্যাক্সের টাকার সদ্ব্যাবহার বলা যায় একে।

ঐতিহ্যবাহী ও ভারি শিল্পগুলোকে বাঁচানোর জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করায় পাশাপাশি মন্দার দেশগুলোর সরকার আর একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। তা হল কৃষি এবং সাধারণ ভোগ্যপণ্য খাতে ভর্তুকী ব্যাপক দেওয়া। ভোক্তা সাধারণকে বাঁচানোর জন্য এ পদক্ষেপ– ভোগ্য পণ্যের বাজার যাতে মন্দার প্রয়োগে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে না যায় সে জন্য এই ব্যবস্থা আর একারণেই বিশ্ববাজারে সাধারণ খাদ্য পণ্যের মূল্য কমছে, এছাড়া গতবছর ক্ষেতে কৃষি উৎপাদন মজুত রয়েছে যথেষ্ট পমিাণে।

তিন.

বাংলাদেশের দ্রব্য মূল্য না কমার কারণ যেমন ব্যাংকগুলোর উচ্চ সুদের ঋণ দান প্রবণতা এবং তেমনি সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দৈন্য। পশ্চিমা বিশ্বে মন্দাও দেখা দিয়েছে ব্যাংকগুলোর উচ্চ সুদের অতিমুনাফার প্রবনতার কারণে।

এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় একটাই– সেটা হল সময়োপযোগী সমাজবাদী রাষ্ট্রকাঠামো অথবা পুঁজিবাদের ধ্রুপদী নিয়মে চলা। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে নিয়মের মধ্যে উচ্চ সুদের ব্যবসাটা বন্ধ করতে হবে। সরকার যদি ব্যবসা করতে চায় তাহলে তাকে ন্যায্য ব্যবসা করতে হবে– বিশেষত জ্বালানি নিয়ে। জ্বালানির দাম বাড়িয়ে রেখে এটা হবে গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার সামিল।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ও অভিঘাত: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

হারাধন গাঙ্গুলী

জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি বিশেষকরে মানুষের নিত্যদিনের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি, ক্রম বৃদ্ধি এবং হাতের নাগাল বা ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ার গোটা প্রেক্ষিতটিই অনভিপ্রেত। যার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অভিঘাত হয় দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক এবং এ ধরনের সমাজের সামষ্টিক মনোজাগতিক বিক্রিয়া অনাকাঙ্খিত। মূল্যবৃদ্ধির কারণের ভিন্নতা থাকলেও পৃথিবীর দেশে দেশে তথা ধনী শিল্পোন্নত, উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র সব ধরনের দেশেই এর প্রকোপের প্রতিক্রিয়া প্রায় একইরূপ। শুধু এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর ভিন্নতার কারণে পার্থক্য লক্ষণীয় হয়ে থাকে।

স্বাধীনতার পর থেকেই দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়মূল্য-বৃদ্ধির প্রকোপে সাধারণ ভোক্তাশ্রেণীর জীবন পর্যুদস্ত হতে থাকে। বিশেষ করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র পুষ্ট তিয়াত্তর-চুয়াত্তর-এর কৃত্রিম দুর্ভিক্ষকালীন সময়ের দাম বৃদ্ধির স্মৃতি আজও দুঃস্বপ্নের মতো মানুষকে তাড়া করে। এই ঘটনাটি বা সময়টি ছিল অস্বভাবিক। কিন্তু

তারপরও দাম বৃদ্ধির ক্রম প্রবণতা থেমে থাকেনি। শুধু মাঝখানে কয়েকটি বছর পঁচানব্বই থেকে দু'হাজার পর্যন্ত নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দামের গতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। তখন ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা সহনীয় অবস্থায় ছিল। তারপর দ্রব্যমূল্য আবার বৃদ্ধি হতে থাকে।

তবে সবচেয়ে আলোচিত হয়েছে ২০০৭ ও ২০০৮ এই দুটো বছরের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি। আমার বক্ষমান এই লেখাটি মূলত: উল্লিখিত সময়ে মূল্য বৃদ্ধির দৃশ্যপটকে সামনে রেখেই আবর্তিত হয়েছে। তবে এখানে তথ্যের কচকচানি যতদূর সম্ভব পরিহার করে মূল্যবৃদ্ধির প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক সংযোগের বিষয়টিই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের মতো দেশসমূহে সর্বদা ক্রিয়াশীল। আলোচনায় সে বিষয়গুলো উঠে আসবে এবং সবশেষে যে সুপারিশ থাকবে, তাতে আমাদের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা শুধু উল্লিখিত দুটো বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সামগ্রিক বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে চলমান ও আগামীর জন্যেও চিন্তার সহায়ক হিসেবে কাজে লাগতে পারে মনে নিয়েই আমি আলোচ্য রচনাটি লেখার চেষ্টা করেছি।

একটু তাত্ত্বিক আলোচনার শুরুতেই, আমি পরিস্কার করে নিতে চাই, সহনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রয় বা বিক্রয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সহায়ক। অর্থাৎ মানুষের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যদি আয় রোজগার বাড়ে এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যদি দ্রব্য মূল্যের ক্রয় বা বিক্রয়-এর বৃদ্ধি ঘটে তাহলে তা শুভলক্ষণ। কারণ তাতে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির আরো প্রনোদনা থাকে। সঠিক ও কাঙ্খিত বণ্টন প্রক্রিয়া দারিদ্র বিমোচনে তখন তা আরো এগিয়ে যেতে পারে। উন্নয়নও ঘটে। তবে আমরা জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির আর্থিক সামর্থের বাইরে ভোগ্যসামগ্রীর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলে যাওয়াকে বুঝে থাকি। এ সময় জনগণের জীবনযাত্রার মানও নেমে যায়।

এর অর্থনৈতিক অভিঘাত হিসেবে বৃদ্ধি পায় বেকারত্ব কিংবা প্রকৃত আয় আরো হ্রাস পায়। পুষ্টিহীনতা, রোগ শোক ব্যধি, সন্ত্রাস, নারীর ক্ষমতাহীনতা, নারী নির্যাতন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের প্রসারসহ অন্যান্য সামাজিক অনাচার ও নীতিহীনতা হয়ে দাঁড়ায় মূল্য বৃদ্ধির সহজাত পরিণতি।

দুই

বাংলাদেশের মতো দেশসমূহে অসহনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সাধারণত: দুটো কারণে হয়ে থাকে। এক. যে কোনো কারণে দেশে উৎপাদিত ও আমদানীকৃত ভোগ্য সামগ্রীর তুলনায় যদি মানুষের চাহিদা বেড়ে যায়। সেটা আর্থিক আয়, ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি, বিদেশে কর্মরতদের পাঠানো অর্থ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। অথবা দুই. দেশের অভ্যন্তরে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করতে গিয়ে যদি উৎপাদন

খরচ বৃদ্ধি পায় তাহলে সাধারণত: শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, তেলের মূল্য বৃদ্ধিসহ টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাস জনিত কারণে আমদানীকৃত কাঁচামাল ও সরঞ্জামাদির মূল্য বৃদ্ধি, দেশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বিভিন্ন পরিসেবার মূল্য বৃদ্ধি, সুদের হার বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি, সরকারের রাজস্বনীতি [কর ও কর বহির্ভূত] এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতিসহ ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাঁজি এবং উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা লাভের কারণে পণ্যের উৎপাদন খরচ এবং আমদানী ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। এ দুটো কারণেই সাধারণত: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় বা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তবে তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়ে থাকে, আমরা যাকে মুদ্রাস্ফীতি বলছি, তা প্রকৃত অর্থে মুদ্রাস্ফীতি নয়; একমাত্র প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বা দাম বৃদ্ধির স্থায়ী প্রবণতা তখনই দেখা দেয় যখন দেশের মানব সম্পদসহ সমস্ত সম্পদ উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে দেয়ার পরে যদি মানুষের আর্থিক আয় বাড়ে, তা হলেই প্রকৃত মুদ্রস্ফীতি দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ যতদিন বেকারত্ব থাকবে, ততদিন প্রকৃত মুদ্রস্ফীতি হবে না। যা হবে তা সাময়িক। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশসমূহে টিকসই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি সুদূর পরাহত। অদক্ষতা, দুর্নীতি, অতি মুনাফা প্রীতি, জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, অতি মাত্রায় সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ বৈষম ও প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং বহি:অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৈষম্যমূলক অভিঘাতের কারণেই আমাদের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হচ্ছে বা মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদন ও যোগান নানা বাধার কারণে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারে না। তাই জনসংখ্যার চাপে সমাজে চাহিদা বাড়লে দামস্তর বাড়ে। সুতরাং অর্থনৈতিক বাধাজনিত অবস্থার কারণে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি বিরাজ করে। আবার ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতিও আছে। যে সমস্ত কারণে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে, যা শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটা বাংলাদেশে বিদ্যমান। এখানে তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে আমদানীকৃত উৎপাদনের কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে, টাকার বিনিময় মূল্য যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে, অভ্যন্তরে মজুরী বাড়ানোর জন্যে শ্রমিক সংগঠনের চাপ আছে, আছে বিদ্যুৎ বিভ্রাটসহ অন্যান্য পরিসেবার মূল্য বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যয় বাড়ছে, বাড়ছে সুদের হার, ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজী প্রকাশ্য কিংবা নিরবে চলছে, রাস্ত-ঘাটসহ অন্যান্য অবকাঠামোর অবস্থার সুবিধাজনক নয়। সব মিলিয়ে উৎপাদনে, বিনিয়োগে অদক্ষতা আর অতি মুনাফাপ্রবণ মানসিক অবস্থান বিদ্যমান। সব মিলিয়ে আমাদের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিজনিত দাম বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। সুতরাং সমস্যা দুটোই আমাদের আছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো দ্রব্যের যোগানে ঘাটতি দেখা দেয়। যোগান ও পরিবহনের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সরকারের পরিকল্পিত বণ্টন প্রক্রিয়ার অভাব যার জন্যে দায়ী। এ ধরনের আঞ্চলিক দাম বৃদ্ধিকে স্থানীয় মুদ্রাস্ফীতি বা 'র‍্যাচেট' মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ভোগ্য পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্ব করে থাকে বাংলাদেশে। উৎপাদন ও আমাদানী থেকে এরা অতিরিক্ত মুনাফা করছে।

একে মার্কআপ মুদ্রাস্ফীতি বা দাম বৃদ্ধি বলে থাকে। দেখা যায় বিশেষ কোনো ভোগ্য পণ্যের দাম বাড়লে জনগণ বিনা প্রতিবাদে তা মাথা পেতে মেনে নেয়। এই প্রতিবাদীহীনতাও 'মার্কআপ' মুদ্রাস্ফীতিকে বা দাম বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

তিন

এখন আমরা সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ ও প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করব। আমাদের বিচার্য সময়টা হলো ২০০৭ এবং ২০০৮ সাল। মূলত: এ দুটো বছরের মূল্য বৃদ্ধি একমাত্র '৭৩-'৭৪ সময়টাকে বাদ দিলে, অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যার ধাক্কা এখনও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না।

সেন্টার ফর ডায়লগ (সিপিডি)-এর হিসেব মতে এ সময়টায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা এতটা নেমে গিয়েছিল যে আতিরিক্ত সাড়ে ৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ আড়াই লাখ পরিবার (১ কোটি ২১ লাখ লোক) দারিদ্রসীমার নিচে চলে যায়। ২০০৮ এর জুলাই মাস নাগাদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এক লাফে ১০ দশমিক ৮২ তে গিয়ে ঠেকে। এর আরকটি চরিত্র ছিল, মূল্য বৃদ্ধির প্রকটতা শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ছিল বেশি।

হঠাৎ করে এই মূল্যবৃদ্ধির কারণটি আসলে কী ছিল? উপরের তাত্ত্বিক আলোচনার আলোকেই বলা যায়, চাহিদা এবং সরবরাহ এ দুটো কারণেই সাম্প্রতিককালে এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

অভ্যন্তরীণ কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে, পর পর দুটো বন্যা এবং সর্বগ্রাসী সিডর। এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি; দেশের উৎপাদনে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়; একদিকে আমদানীকারক ও অন্যদিকে বেপারী পর্যায়ে বাজারে সংঘাত বিরাজ করছিল। এছাড়া বিভিন্ন স্টোক হোল্ডারদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের ঘাটতি, প্রচুর বাজার মধ্যস্থতাকরীদের অবস্থান, দুর্নীতি দমন অভিযানের কারণে বাজার কাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে এলোমেলো হয়ে পড়া, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি, সুদের হার ও ব্যাংক চার্জ বৃদ্ধির কারণে ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বেড়ে যাওয়া, প্রাতিষ্ঠানিক মনিটরিং মেকানিজমে ঘাটতি, এবং জিনিসপত্রের দাম আরো বাড়বে এ ধরনের একটি আশংকা জনগণের মনে ক্রিয়াশীল থাকা ইত্যাদি কারণে তখন দ্রব্যমূল্য এতোটা বেড়ে গিয়েছিল।

বাহ্যিক কারণগুলোর মধ্যে পড়ে, প্রধান প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলোর প্রতিকূল অবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে পণ্যসরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়; শস্য যেমন গম, ধান ক্রমবর্ধমান জৈব জ্বালানী উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়ায়, প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি; তেল ও পেট্রোলজাত সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি ও নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ না হওয়া; উল্লিখিত কারণগুলোকে একটু তলিয়ে বিচার করলেই বোঝা যাবে সাম্প্রতিক দাম বৃদ্ধির প্রবণতার কারণ মূলত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি জনিত কারণ। যা সরববরাহ দিকটিকেই (সাপ্লাই সাইড) নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে পণ্যসামগ্রীর বিপনন একটি জটিল ঘূণাবর্তে পাক খায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রায় সিংহভাগই বিদেশ থেকে আমাদানী করতে হয়; অথচ আমদানীকারকদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এরাই আমাদানীর ক্ষেত্রে উল্লেযোগ্য ভূমিকা পড়ছে অলিগোপনিষ্টিক চরিত্রের (পণ্য ভিত্তিক অনধিক ৪ জন বা মুষ্টিমেয় সরবরাহকারী বা উৎপাদক)।

দেশীয় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিপনন ক্ষেত্রেও রয়েছে জটিলতা। এ ক্ষেত্রে পাইকারী ব্যবসায়ী যেমন আড়ৎদার/পাইকারের সংখ্যা হলো মুষ্টিমেয়। বিপরীতে খুচরা বিক্রেতাদের সংখ্যা অসংখ্য। ফলে এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে একাধিক মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যস্বত্বের অবস্থান। ফলে এত হাত বদলের কারণেই মূল্য বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে সিণ্ডিকেট, মজুতদারী বা নাশকতামূলক কারসাজি। তবে এমন কোনো সিন্ডিকেটের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এখানে আমি বলতে চাই, গোটা বিপনন ব্যবস্থার জটিলতা ও অসম্পূর্ণতাই মূল্য বৃদ্ধির পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে। ঐ দৃশ্যপটটি আমাদের চিরায়ত এবং স্থায়ী। কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিপননে ঐ ধরনের হাতবদলের অথবা মধ্যস্থতাকারীর অবস্থানের অস্তিত্ব তুলে ধরতে চাই মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখানোর জন্যে।

ক. চাল

চালের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যায় পর্যন্ত মূল্যের তারতম্য দাঁড়ায় ৪০ শতাংশ। এর মধ্যে ধান থেকে চালে রুপান্তর প্রক্রিয়ায় মিলগুলোর খরচ হয় ২ দশমিক ৩ শতাংশ (খুচরা মূল্যে বিক্রি অনুসারে)। পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে মার্জিন থাকে ৮ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে। জরীপে দেখা গেছে চালের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চালের সরবরাহ চেইনে মিল মালিকরা মূল্য নির্ধারণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। ধান কাঁটা মৌসুমে মিল মালিকরা কৃষক বা অন্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ধান কিনে নতুন করে বাজার চাহিদা অনুযায়ী প্রক্রিয়া করে চাল সরবরাহ করে থাকে। বাজার সিগনাল অনুযায়ী তাদের এই কার্যক্রম চলে। মজার বিষয়টি হলো মিল ও আড়তদারদের মাঝখানে আরেকটি হাত কাজ করে। যাকে বলা হয় পার্টি। এই পার্টি বাজার নেটওয়ার্কিং সামর্থ, বাজার তথ্য, স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদিকে পুঁজি করে মাঝখানে থেকে মুনাফা হাতিয়ে নেয়। দেখা গেছে, এই পার্টির অবস্থানের বিকল্পও বর্তমান বাজার কাঠামোতে নেই। অথচ এই পার্টির অবস্থান না থাকলে চালের বাজার আরো বেশি প্রতিযোগিতামূলক হতে পারতো।

খ. আটা

গম বা আটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মাঠ পর্যায়ে ৩৫ শতাংশ উৎপাদন খরচ এবং ১৫ শতাংশ কৃষকের আয় ধরে নিয়েই মাঠ পর্যায় থেকে খুচরা বিক্রি পর্যন্ত ভ্যালু

চেইনে পার্থক্য হয় ৪০ শতাংশ। দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গম ভাঙ্গিয়ে আটা করে ভোক্তাপর্যায় যাওয়া অবদি ৪ ধরনের বাজার ও ৮ বার হাত বদল প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে হয়।

গ. ডাল

দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত ডালের বিপননে ৪ ধরনের বাজার ও ৬ বার হাত বদল প্রক্রিয়া চলে। এখানে উৎপাদন এবং আমদানি ব্যয় খুচরা মূল্যের ২২ শতাংশ এবং উৎপাদনকারীর লভ্যাংশ ৩৫ শতাংশ ধরে নিয়েই এই হাত বদলের কারণে মাঠ পর্যায় থেকে খুচরা বিক্রি মূল্যের মধ্যে পার্থক্য ঘটে যায় ৪৩ শতাংশ।

ঘ. আলু

আলু সরবরাহে ৬ টি প্রধান মার্কেটিং চেইন ও ৬ পর্যায়ের বাজার মধ্যস্থতাকারীর হাত বদল করতে হয়। এ কারণে খুচরা মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে ব্যয়ের ৫৩ থেকে ৬২ শতাংশ চলে যায় উৎপাদন খরচ হিসেবে। বাদবাকি ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ গিয়ে ওঠে পাইকার, খুচরা বিক্রেতাসহ বিভিন্ন মধ্যস্থকারীদের পকেটে। আলু বিপননে হিমাগার মালিকরা মূল্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরা মূল্য নির্ধারক হিসাবে অনেকটা খেলোয়াড়ের ভূমিকায় থাকে।

ঙ. ভোজ্য তেল

বাংলাদেশে ভোজ্য তেলে অর্থাৎ সোয়াবিন ও পাম অয়েলের গোটাটাই আমাদানিকৃত। এখানে খুচরা মূল্যের ৫৯ থেকে ৬৩ শতাংশ আমাদানি ব্যয় হিসেবে বাদ দিলে, অবশিষ্ট ৩৭ থেকে ৪০ শতাংশ চলে যায় আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার হাতে। এখানেও ৩ ধরনের বিপনন ব্যবস্থা এবং ৫ বার হাত বদলের স্তর ক্রিয়াশীল থাকছে।

চ. পেঁয়াজ

পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। খুচরা মূল্যে ৩৬ শতাংশ উৎপাদন ব্যয়, ২১ শতাংশ উৎপাদনকারীর মার্জিন এবং খুচরা মূল্যের ৪৫ শতাংশ পায় বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্থতাকারীরা।

ছ. সবজি

এখানে খুচরা মূল্যের ৪১ থেকে ৪৩ শতাংশ যায় উৎপাদন খরচে। প্রায় ৬০ শতাংশ যায় বিভিন্ন বাজার মধ্যস্থতাকারীদের হাতে। খুচরা বিক্রেতারা পচনশীল পণ্য বিধায়

একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ঝুঁকি প্রিমিয়াম ধরে নিয়ে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

আমাদের বাজার কাঠামোর চিরাচরিত অসম্পূর্ণতা এবং জটিলতার কারণে স্বাভাবিক কারণেই যে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হয়, উপরে বর্ণিত কয়েকটি নিত্যদরকারী ভোগ্যপণ্য বিপননের চিত্রই তা প্রমাণ করে। এটা শুধু উল্লিখিত পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, প্রতিটি ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তা দেশে উৎপাদিত বা তৈরি হোক আর আমদানিজাতই হোক। তবে এর অর্থ এই নয় যে এখানে কোনো দুর্নীতি, অরাজকতা, চাঁদাবাজী এবং দলবাজী কেন্দ্রীক রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ক্রীয়াশীল থাকছে না। বাজার অপূর্ণতার সাথে এই সমস্ত উপাদানও একই সাথে কাজ করছে এবং পণ্যের সরবরাহ দিকটিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। যার কারণে কোনো কোনো সময়ে দ্রব্যমূল্যের গতি দ্রুত ভোক্তাসাধরনের নাগালের বাইরে চলে যায়। নেমে আসে তাদের জীবনে বিপর্যয়। লণ্ড ভণ্ড হয়ে পড়ে সামাজিক, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা। ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিবেশী এবং সামাজিক জীবন ধারার সর্বক্ষেত্রে শ্রেয়বোধ, হয় নির্বাসিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ।

চার

তা হলে ভোক্তা সাধারণের নাগালে বাইরে চলে যাওয়া নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণ এভাবে আমরা বিহ্নিত করতে পারি :

১. দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগানে ঘাটতি থাকছে।

২. আমাদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে পাইকারী দামের সাথে প্রকৃত কোনো পার্থক্য নাই।

৩. দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের দামের সাথে পাইকারী বিক্রয় দামের অযৌক্তিক পার্থক্য বিদ্যমান।

৪.বাজার শক্তি মুষ্টিমেয় নিয়ন্ত্রণকারীর হাতে কেন্দ্রীভূত। এর ফলে বাজার অলিগোপলিষ্টিক চরিত্র (মুষ্টিমেয় বিক্রেতা) ধারন করে নিজেদের মধ্যে অঘোষিত চুক্তির মাধ্যমে অতি মুনাফার উদ্দেশ্যে দামের কারসাজি, পণ্য সরবরাহে নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণ, মজুত গড়ে তুলে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে বাজারকে প্রতিযোতিাহীন করার প্রয়াস।

৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কতিপয় পদক্ষেপ বাজারের স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত

করেছে। দুর্নীতি দমন ও মুজত বিরোধী অভিযানের কারণে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করে। এ ছাড়াও অবৈধ স্থাপনা ও সাময়িক হাট-বাজার ভেঙ্গে দেয়ার কারণে বাজারে খুচরা বিক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পায়। এ ছাড়াও পণ্যের মানোন্নয়ন নিরীক্ষর নামে অভিযান চালানো হয়। এই সমস্ত কিছুই বাজারে পণ্য সরবরাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চাঁদাবাজী নিয়ন্ত্রিত হলেও তেলের মূল্যে বৃদ্ধি ও মালামাল পরিবহনের আইন যথার্থভাবে মেনে চলার কারণে পণ্যের একক প্রতি পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায়। ফলে সার্বিক বাণিজ্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৭. দ্রব্যমূল্য আরো বেড়ে যেতে পারে মানুষের মধ্যে এ ধরনের একটা আতঙ্ক কাজ করছিল। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। এ ছাড়া দুটো পর পর বন্যা এবং ঘূর্ণিঝর 'সিডর'-এর কারণে আমন ও বোরো ফসল মার খায়। ফলে খাদ্যে মুল্যস্ফীতি দেখা দেয় এবং মানুষের আতংক আরো ঘনিভূত হয়।

৮. ব্যাপক মজুত বৃদ্ধির ফলে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনাও ঘটেছে।

৯. এ ছাড়া পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হয়েছে রাজনীতি সমর্থিত নাসকতার কারণে।

মোটামুটি এভাবে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলোকে মোটা দাগে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

পাঁচ

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং এর উর্ধ্বগতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাবার প্রয়োজন এখানে নেই। এখানে মত ও পথের পার্থক্য রয়েছে প্রচুর। তারপর রয়েছে দেশে দেশে উন্নয়ন স্তর ভেঙ্গে কাঠামোগত পার্থক্য। সুতরাং নীতিগত ও কৌশলগত তিনটি ধারায় উর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্যের লাগাম ধরে রাখতে হবে বাংলাদেশে। এবং সেটা করতে হবে ১. বাজার ভিত্তিক ২. বাজার বহির্ভূত এবং ৩. প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে।

শুধু চাহির দিকটিই নয়, যোগানের দিক থেকেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা বেগবান হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মূলত: যোগানের সমস্যার (সাপ্লাই সাইড প্লোবলেম) কারণেই ঘটছে। আর যোগান প্রশ্নে দেশের উপাদান ও বৈশ্বিক উপাদান একসাথে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধানতম উপায় হলো দ্রব্য সামগ্রীর যোগান বাড়ানো্ এবং সে লক্ষে দেশীয় উৎপাদন ও আমদানী বাড়াতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন সামষ্টিক অর্থনীতি শক্তিশালী করে একদিকে রাজস্ব আয় বাড়ানো এবং অন্যদিকে সরকারি

ব্যয়ের গুণগত মানোন্নয়নে বাস্তব ভিত্তিক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা। মোট কথা উৎপাদন খাতের দক্ষ বিকাশ ছাড়া দ্রব্যমূল্য স্থিরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

এর সাথে সাথে স্বল্প মেয়াদী প্রশ্নে, নিম্ন আয় ভোগী যে জনগোষ্ঠী রয়েছে, যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে, ভূমিহীন কৃষক, দুস্থ-মহিলা, তালাকপ্রাপ্ত মহিলা, বিধবা, কর্মক্ষমহীন বৃদ্ধ– এদের জন্যে নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করতে হবে। আমরা দেখেছি, গ্রামে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বা প্রবণতা শহরের থেকে বেশি। সুতরাং গ্রামঞ্চলে আয় রোজগারের পথ তৈরির লক্ষে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, কাজের বিনিময়ে টাকা, ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচীর আরো দক্ষ সম্প্রসারণ করা দরকার।
গ্রামঞ্চলে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি মুখী স্থায়ী অবকাঠামো বিনির্মাণের লক্ষ নিয়েই উল্লিখিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী চিহ্নিত করে এগুলোর দাম স্থিতিশীল রাখতে নীতি নির্ধারণী ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

এ লক্ষে নিত্য দরকারী পণ্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮১ এর প্রয়োজনীয় সংস্কার হতে পারে। বাজারে পণ্য সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ কয়েকটি হতে যে কেন্দ্রীভূত রয়েছে, যে অলিগোপলিষ্টিক অবস্থান রয়েছে তা ভাঙ্গতে হবে এবং বাজারকে প্রতিযোগিতামুখী করতে হবে।

এ লক্ষে উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যের সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। বাজার নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে জোরদার করে মূল্যের মনিটরিং ব্যবস্থাকে দক্ষ করতে হবে।

বর্তমানে চাল ও গম আমদানিতে শূণ্য শুল্ক রয়েছে। আমরা মনে করি, এর আরো সম্প্রসারণ করে আমদানিকৃত অন্যান্য নিত্য পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেও শূণ্য শুল্ক চাল করা যেতে পারে। একইসাথে আমাদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর আন্তর্জাতিক দরদাম সম্পর্কেও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার। কৃষির উৎপাদন ব্যয় কমাতে সাহসী রাজনৈতিক অবস্থান নেয়া দরকার।

একই সাথে আমদানিকারকদের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায়, বিশেষকরে ছোট ছোট আমদানিকারকরা যাতে বড়দের সাথে প্রতিযোগিতায় আসতে পারে সেই সুযোগ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তৈরি করতে পারে। এছাড়া দেখা গেছে এল সি খোলার সময়ে মার্জিন নির্ধারিত হয় ব্যাংক ও আমদানিকারক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। মার্জিন বেশি হলে আমদানিকৃত পণ্যের বিশেষ করে চালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেশি হয়। এ ক্ষেত্রে এল সি মার্জিনের হার কমানো দরকার যাতে করে আমদানিকৃত পণ্যের বাজার দর কম হয়। পণ্য পরিবহন ব্যয় অহেতুক যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ ক্ষেত্রে পরিবহনকালে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম প্রতিহত করতে হবে। বাজারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে বাজার শক্তির অবাধ বিচরণের ইস্যুটি আবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে; সাম্প্রতিক পশ্চিমা

জগত বিশেষ করে মার্কিন মুল্লুকের আর্থিক শৃঙ্খলার ধ্বস আবার তা প্রমাণ করলো। সে আলোকেই বলা যায়, অভ্যন্তরীণ বাজার হিসেবে বাংলাদেশের বাজার কখনই আর অবাধ হবে না। বাজার 'ডিসটরসন' হবেই। অলিগপোলিষ্টিক চরিত্র/প্রকৃতি মাথা চারা দিয়ে উঠবেই।

তাই বাজার নিয়ন্ত্রণে টি সি বি'কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরো সংগঠিত ও শক্ত অবস্থানে রাখা দরকার। এর বিকল্প নেই। পাশাপাশি বাজার অসম্পূর্ণতা দূর করতে 'উৎপাদান সমবায় ও বিপনন' জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সংগঠনও গড়ে তোলা যেতে পারে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবস্থান, উন্নয়ন স্তর এবং বাজার প্লেয়ারদের অবস্থান বিবেচনায় রেখে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে স্বল্প, মধ্যম ও কতিপয় দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব আলচ্য প্রবন্ধে উত্থাপন করা হলো।

ছয়

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আমাদের আতংক। উন্নয়ন বা বিনিয়োগ সহায়ক যে সহনশীল মূল্য বৃদ্ধি তা আমাদের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতায় কখনও উপলব্ধ হয়নি। বরং দ্রব্যমূল্য চলে গিয়েছে তাঁর বেঁচে থাকা সাধ্যের যোজন যোজন দূরে। দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীএর ফলে শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয় সামাজিক ভাবেও হয়েছে পর্যুদস্ত। আর নিম্নবিত্তরা চলে এসছে প্রান্তিক সীমানায়। তাদের পারিবারিক ও সামাজিক শ্রেয়বোধ লোকচক্ষুর অলক্ষ্যে হয়ে গেছে লণ্ডভণ্ড। তারা না পারছে মুটে বইতে, রিক্সা চালাতে, অন্যের জমিতে কাজ করতে। আবার বাঁচতেওতো হবে!

সুতরাং এরই পরিণতিতে দেখি সন্ত্রাসের কালোথাবার সম্প্রসারণ, ছিনতাই, বেশ্যাবৃত্তি, নারী পাচার ও নারী নির্যাতন, শিশু শ্রমের বিস্তার ইত্যাদি সামাজিক অবক্ষয়ের প্রসার যেগুলো কখনও প্রকাশ্য কখনও অপ্রকাশ্য।

সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধির সামাজিক অভিযাতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি বা হচ্ছে না। এই মূল্য বৃদ্ধির যাতাকলে যে অতিরিক্ত সাড়ে ৮ শতাংশ থেকে নতুন করে দারিদ্র সীমার নিচে চলে এসেছে তারা আমাদের জন্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক কী কল্যাণ বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে তা কি একবারও ভেবে দেখবার দরকার নেই? আমাদের দেশে যে অতলান্তিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, মরার ওপরে খাড়ার ঘা'য়ের মতো সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা কি তাকে আরো সংকটময় করেছে না? সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টেনে রেখেই আমাদের কাঙ্খিত প্রবৃত্তি অর্জনের পথে/উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি পণ্যের কৃত্রিম মূল্য নিয়ন্ত্রণও সমান অপরাধ। দুর্নীতি মুক্ত একটি দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই পারে এ সব সমস্যার সমাধান দিতে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.
২.
৩.
৪. Recent inflation in Bangladesh, Trends, Determinants and impact an
poverty - CPD

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থার প্রতিকার

আ দি ত্য ন জ রু ল

সময় নাকি অর্থনীতি, মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে? এমন প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া মুশকিল। অর্তনীতিবীদগণ বলবেন– অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডই জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে। দার্শনিকগণ বলবেন– সময়। সমাজবিজ্ঞানী বলবেন– উন্নয়নের গতি মন্থর। ভৌগলিকবিদগণ বলবেন– শিল্পে ও কৃষি কার্যে প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণের অভাব।

যে যাই বলুন না কেন। বর্তমান সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে মানুষ যে ক্রয় ক্ষমতা হারিয়েছে, তা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। শুধু নিম্নবিত্ত নয়, এর আঁচ লেগেছে মধ্যবিত্ত সমাজেও। সমস্যা জর্জরিত শিল্পক্ষেত্র। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার

চাপ আর বিশ্ব বাজারে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বাজার ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বিকলাঙ্গতা। এই বিকলাঙ্গতার জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা। বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হলে কৃষকেরা উৎপাদিত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাবে। ফড়িয়া বা দালাল শ্রেণী অতি মুনাফা করা থেকে বিরত থাকবে। স্থানীয় আড়তদার ও অন্যান্য মধ্যস্তাকারীদের অতি মুনাফা করার আচরন হ্রাস পাবে। বাজার ব্যবস্থার এ সমস্ত ত্রুটি দূর করে গ্রামের সর্বত্র সুষ্ঠু বাজার তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করে বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যায়। আর এ সব কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে। বাজার পাগলা গোড়ার মতো আচরন করবে না। ভোক্তার আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই পরিবর্তন হবে দ্রব্যমূল্যের। দ্রব্যমূল্য প্রভাবের মধ্যে আয় প্রভাব এবং পরিবর্তক প্রভাব নিহিত থাকে। তাই বাজার নিয়ন্ত্রণকারীদের দাম প্রভাব এবং সেই দাম প্রভাবকে আয় প্রভাব ও পরিবর্তক প্রভাবের মধ্যে বিভক্ত করার পদ্ধতি জানতে হবে।

প্রবৃদ্ধি, তারল্য, জিডিপি, ভারসাম্য বিন্দু ইত্যাদি যার কারণেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাক না কেন– সাধারন মানুষের একান্ত কাম্য দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাক। বর্তমান সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে সাধারন মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। ভোক্তারা জানতে চায় কেন এমনটি হচ্ছে? সরবরাহ অথবা উৎপাদনের অভাবেই কি তাহলে দ্রব্যমূল্য পাগলামি করছে? নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে? সাধারন মানুষ অর্থনৈতির তত্ত্ব জানতে চায় না। তারা চায় দ্রব্যমূল্য তাদের ক্রয় ক্ষমতার নাগালেথাক। আসলে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ কী? মূল্যবৃদ্ধির সঠিক কারণ উত্তর খুঁজে পেতে হলে প্রথমে প্রয়োজন এর নিয়ন্ত্রণ, দ্বিতীয়ত প্রয়োজন একটি সঠিক সমাধানের পথ। যা অনুসরণ করলে আমাদের বাজার পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। "Decision making involves the selection of a course of action from among two or mor possible alternative in order to arrive at a solution for a given problems." সকল কিছুই যদি হয় ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তাহলে শুধু দ্রব্যমূল্য এমন অস্থিতিশীল আচরণ করছে কেন? দ্রব্যের দাম কমলে বাজেট রেখা প্রসারিত হয়ে থাকে। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায় দ্রব্যের দাম কমার কারণে ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। শুধু তাই নয়– প্রয়োজনের তুলনায় ক্রয় ক্ষমতা অর্ধেকে নেমে এসেছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অর্থনৈতিক কার্যাবলী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধা হয়। কিন্তু আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায়এর কোনো প্রতিফলন তো দেখছিনা। তা হলে কি তাত্ত্বিক দিক থেকে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পেলেও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? খরিদ্দার, ভোক্তা, অথবা ক্রেতা যাই হোক না কেন– তারা কী অসহায় হয়ে থাকবে এই অস্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ওপর। মুক্ত বাজার বা অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হয় প্রতিযোগিতামুলক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। এমনকি দ্রব্যমূল্য

স্থীর কিংবা কমতেও শুরু করে প্রতিযোগিতামুলক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কী তা হলে এর উল্টো নিয়ম। যদি তাই হয় তাহলে নীতি গ্রহণ করার পূর্বেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট কিংবা দ্রব্যমূল্যের কথা চিন্তা করেছেন না কেন ব্যবসায়িক নীতি নির্ধারকগণ। মূলত একটি দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পাশাপাশি স্থিতিশীল বাজার কাঠামো। আর একটি স্থিতিশীল বাজার কাঠামোতে কখনো দ্রব্যমূল্যের এমন আচারণ লক্ষ্য করা যায় না। বলা বাহুল্য সকল ক্ষেত্রে সংস্কার জরুরি। এমনকি সরকার পরিবর্তন হলেও নীতি তুলনামূলকভাবে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে। ব্যবসায়িক ও দ্রব্যমূল্য নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে সর্ব স্তরে নীতির বিষয়গুলো বোধগম্য' হয়। যেহেতু আমাদের ব্যবসায়িক মহলের সর্বস্তরে শিক্ষার অপ্রতুলতা রয়েছে। শুধু তাই নয় ভোক্তাদের কাছেও হতে হবে নীতি বোধগম্য। যদি সকল ক্ষেত্রেই এই নীতি অনুসরণ করা যায় তাহলে উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে। এতে বাজার পরিস্থিতি থাকবে নিয়ন্ত্রণে। কখন এবং কী কী শর্তে পণ্যমূল্য পরিবর্তন হবে তাও পণ্য বিক্রেতা ও ভোক্তাদের জানতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ভোক্তাদের পাশাপাশি বিক্রেতাদের ও দায়িত্বশীল হতে হবে। সরকারকে গ্রহণ করতে হবে সুদূর প্রসারি পরিকল্পনা। উদ্যোগহীন অদক্ষ ব্যবস্থাপক সড়িয়ে দিতে হবে শিল্পক্ষেত্র থেকে। উৎপাদিত দ্রব্যের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি সরকারকে নিতে হবে দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং অভিভাবকত্ব-সুলভ আচরণ। এখনো 'সোঁনালি আঁশের কথা' বিগত দিনের গল্প হয়ে যায়নি। এই সম্ভাবনাময় পাটকে বাঁচানোর জন্য সরকার কি কখনো নিয়েছিল প্রয়োজনীয় কর্মসূচী। উৎপাদনকারীদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে সমালোচক এবং শুভানুধ্যায়ী মহল উদ্বেগ ও সহয়াতার কথা বললেও আজও পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। গ্রহন করা হয়নি কোনো নতুন প্রযুক্তি ও কর্মপন্থা। চাহিদা সঙ্কুচিত হচ্ছে, রুগ্ন হচ্ছে শিল্প, পক্ষান্তরে দাম বাড়ছে পাটজাত দ্রব্যমূল্যের। এই উদাহরণ থেকে এ কথাটি স্পষ্ট যে, আমাদের দেশে পণ্যদ্রব্য বা কাঁচামালের অতি উৎপাদনের সুযোগ কখনোই গ্রহন করতে পারেনি সরকার। ফলে কৃষকরা একবার পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে মুনাফা থেকে বঞ্চিত হলে দ্বিতীয়বার আর সেই পণ্য উৎপাদন করতে চায় না। এর পেছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আমাদের দেশে কৃষক শ্রেণী মূলধনের অভাবে কখনো কখনো বীজও কিনতে পারে না। শস্যক্ষেত্রে সার, কীটনাশক প্রয়োগ করতে পারে না। রয়েছে প্রয়োজনীয় সেচের অভাব। সর্বক্ষেত্রে এই অব্যবস্থাপনা দূর করতে না পারলে কখনো কি কমবে দ্রব্যমূল্যের দাম। এই দ্রব্যমূল্য কিন্তু মানুষের জীবন যাত্রায় বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মানুষে-মানুষে, সমাজে-সমাজে যে বিভাজন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাও কিন্তু এই অর্থনৈতিক কারণে।

দার্শনিক জন রাস্কিন (Joun Ruskin) বলে ছিলেন, শিল্প মানুষের পরিশ্রমের আনন্দ। প্রত্যেকটি পরিশ্রমী মানুষই শিল্পী। তাহলে কী আমাদের দেশে যারা উৎপাদনের সাথে যুক্ত, যাদের শ্রমে ঘামে উৎপাদিত হচ্ছে বহুমুখী শস্য; তারা কী শিল্পী নন? তারা কী পেয়েছে তাদের শ্রমের সঠিক মুজরী।

বার বার বঞ্চিত হচ্ছে শ্রমীক-শিল্পী। লাভবান হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী। ক্রয় ক্ষমতায় অসহায় বোধ করছে ভোক্তা। তাই এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পেতে হলে পণ্যের উৎপাদন খরচের উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বাজার পরিস্থিতি, বণ্টন প্রণালী, পণ্যের মান, উৎকর্ষ ইত্যাদির ওপর। খুঁজে বের করতে হবে পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, বিক্রয় সংগঠনগুলোর দুর্বলতা। তবেই বর্তমান সময়ের এই অস্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। হ্রাস পাবে দ্রব্যমূল্যের এই পাগলামী।

বিশ্বমন্দা: বিশ্ব পুঁজিবাদের মহাসংকট

এ ম. এ ম আকাশ

বিখ্যাত বুলগেরিয়ান বামপন্থী নেতা "জর্জি দিমিত্রভ" ফ্যাশিস্ত কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "এপার্সি মুভ" অর্থাৎ "পৃথিবীটা ঘুরছে"। আসলেই "পৃথিবীটা ঘুড়ছে"। না হলে ১৯৯০-২০০৮ এই মাত্র ১৮ বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে এরকম টাল-মাটাল অভাবনীয় পরিবর্তন ঘট্‌লো কি ভাবে?

১৯৮০-র দশকের শেষের দিকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দূর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন ধ্বস নেমেছিল, একের পর এক পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যখন তীব্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত হচ্ছিল তখন পুঁজিবাদী শিবিরের তাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লাসের বন্যা বয়ে যায়। তখনই ফুকুয়ামা লেখেন "দ্য এ অব হিস্টরি" যার মূল কথা হচ্ছে "পুঁজিবাদই ইতিহাসের শেষ কথা"। বুর্জোয়া প্রেসগুলি "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে" ইতিহাসের "একটি দুর্ঘটনা" এবং "অস্থায়ী উত্তরণ-

পর্ব" হিসাবে চিত্রিত করে তখন আক্রমনাত্মক প্রচারাভিযান চালায়। ঘোষণা করা হয় "Socialism is the longest transition from capitalism to capitalism" ("সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের দীর্ঘতম উত্তরণ পর্ব")।

আমেরিকায় রিপাবলিকান দলের নেতা প্রাক্তন চলচ্চিত্র অভিনেতা রোনাল্ড রিগ্যানের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন হন রক্ষণশীল দলের নেতৃ "লৌহ মানবী" মার্গারেট থেচার। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌রা বলতে থাকেন যে "বাজার" এবং "ব্যক্তি মালিকানা" এই দুটো বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের মত পবিত্র। এদের সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে যে কোন অর্থনীতি ও সমাজকে সীমাহীন বিকাশের পথে নিয়ে যাওয়ার। যখন এই "নব্য উদারবাদ" বা নামান্তরে "বাজার মৌলবাদের" বিরুদ্ধে কীনসের অনুসারী নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদেরা "রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের" বা "বাজার নিয়ন্ত্রণের" কথা বলতেন তখন তাদেরকে প্রচুর গালাগালির সম্মুখীন হতে হত। আমেরিকার অন্যতম জনপ্রিয় অর্থনীতির টেক্সট বইয়ের লেখক কনিষ্ঠতম হার্ভার্ড প্রফেসর ব্রিলিয়ান্ট অর্থনীতিবিদ ম্যান্সফিল্ড তার কুকুরের নাম দিয়েছিলেন "কীনস্"।

নব্য উদারবাদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে "No lunch is free"। কখনোই বিনামূল্যে বা ভর্তুকী দিয়ে অর্থনীতি চালানো উচিৎ নয়। সুতরাং কৃষি, শিশু শিল্প, খাদ্য, জ্বালানী, স্বাস্থ্য, আয় বৈষম্য, দারিদ্র্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপ অনুমোদন না করাই ভাল। এগুলিকে রাষ্ট্রিয় হস্তক্ষেপেশূন্য বাজার প্রক্রিয়ার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সুপারিশ করা হয় সাপ্লাই সাইড ইকনমিক্স এর। সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রকে পরামর্শ দেয়া হয় "Deregulation" বা "বিনিয়ন্ত্রনের"। পরামর্শ দেয়া হয় ধনীদেরকে এবং বড় বড় কর্পোরেশনকে কর ছাড় দেয়ার, যাতে তারা উৎসাহিত হয়ে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ করেন এবং তাতেই "আয় ও কর্মসংস্থান" বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে ভাবা হতে থাকে। বলা হতে থাকে রাষ্ট্রিয় হস্তক্ষেপ ছাড়া বাজার ও ব্যক্তি-মালিকানা ভিত্তিক প্রবৃদ্ধিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতি এবং এতেই চুঁইয়ে পড়ে দরিদ্ররা উপকৃত হবেন এবং তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। বলা হয় আয় ও সম্পদ বন্টনের মৌলিক বৈষম্যটি ঠিক করার জন্য "সমাজতান্ত্রিক নীতি" শুধুই আরো বেশি বেশি করে "আমলাতন্ত্র"–"অদক্ষতা"–"দুর্নীতির" জন্ম দিতে বাধ্য। সুতরাং সে পথ পরিপূর্ণ ভাবে পরিত্যাজ্য।

দুই

"নয়া ধ্রুপদী" অর্থনীতিবিদ্‌রা, "কেনীসিয়ান অর্থনীতিবিদরা", "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদরা", "কল্যান পুঁজিবাদের" সমর্থক "সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা" এবং সর্বোপরি কমিউনিস্টরা অবশ্য এ ধরণের চরম মতবাদকে কখনোই বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেন নি। যতদূর আমার স্মরণে আছে, আমাদের দেশের একজন অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি জনাব আহ্‌মদ শরীফ নব্য উদারবাদের উত্থান পর্বে অনেকটা এই ধরণের কথা

বলেছিলেন: 'আমি এত বোকা নই যে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত সমাজতন্ত্রের বিকল্প প্রস্তুত হয় নি বলে প্রমাণিত পঁচা পুঁজিবাদকে বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করবো।'
এই সময় তাই শুরু থেকেই "নব্য উদারবাদ" এবং তথাকথিত "ওয়াশিংটন কনসেনসাস" মতবাদটি খোদ বুর্জোয়া মহলের ভেতরে এবং বাইরে নানা ধরণের "প্রতিরোধের" মুখোমুখি হতে থাকে। অনেক নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ্ পন্ডিতেরা শুরু থেকেই এই পাগলামির রশি টেনে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এদের মধ্যে জোসেফ স্টিগলিটজ্, অমর্ত্য কুমার সেন এবং সর্বশেষ নোবেল বিজয়ী গল ক্রুগম্যানের নাম উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশের বামমহলে বহুল নিন্দিত নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ড. ইউনুসও বর্তমানে "নব্য-উদারবাদকে" প্রত্যাখান করে "সামাজিক উদ্যোগের" কথা বলছেন। অবশ্য এ বিষয়ে বহু বিতর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন উঠতে পারে "ঘড়ির কাঁটা" ১৯৯০ থেকে ২০০৮ এই মাত্র ১৮ বছরে এত দ্রুত ঘুড়ে গেল কি ভাবে? এর উত্তর হচ্ছে "Facts are very stubborn", "সত্য হচ্ছে খুবই শক্তিশালী"। একজন অত্যন্ত মেধাবী, মানবতাবাদী ও বিপ্লবী অর্থনীতিবিদ তার বিশ্ববিখ্যাত এক গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে ১০০ বছরেরও বেশী আগে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, "The credit system appears as the main lever of over production and over speculation in commerce solely because the reproduction process, which is elastic by nature is here forced to it's extreme limits, and is so forced because a large part of the social capital is employed by people who do not own it and who consequently tackle things quite differently than the owner, who anxiously weighs the limitations of his private capital in so far as he handles it himself...the two characteristic immanent in the credit system are, on the one hand, to develop the incentive of capitalist production, enrichment through exploitation of the labour of others, to the purest and most colossal form of gambling and swindling, and to reduce more and more the number of the few who exploit the social wealth, on the other hand, to constitute the form of transition to a new mode of production. It is this ambiguous nature, which endows the principal spokesman of credit from law to Isaac Pereira with the pleasant character mixture of swindler and prophet"
(Karl Marx, Capital-Vol-3, Progress Publishers, Moscow, 1971, p-441)

["ঋণ ব্যবস্থা আবির্ভূত হয়েছে অতি উৎপাদনের এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে অতি-ফাট্কাবাজির প্রধান "লীভার" বা চালক হিসাবে, শুধুমাত্র এই জন্য যে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া প্রকৃতিগতভাবেই নমনীয় এবং একে চাপ দিয়ে টেনে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে

যাওয়া সম্ভব আর সামাজিক পুঁজির বিরাট একটি অংশ এমন সব লোকেরা এখন ব্যবহার করবেন যারা নিজেরা এর মালিক নন। এবং সেজন্যই তাদের ব্যবস্থাপনার কৌশল, যারা প্রকৃত মালিক তাদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে বাধ্য। প্রকৃত মালিকরা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পুঁজি ব্যবহারের সময় প্রতিটি সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি অনেক বেশি হিসাব করে চলে থাকেন....ঋণ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দু'টো মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– একদিকে তা পুঁজিবাদী উৎপাদনকে পুঁজি যুগিয়ে শ্রমশক্তি শোষণের মাধ্যমে আরো বিকশিত হওয়ার উৎসাহ সৃষ্টি করে, অল্প কিছু লোকের হাতে ধন কেন্দ্রীভূত করে এবং অন্য দিকে তা জুয়া খেলা ও ফাটকাবাজির প্রতি বিশাল ও খাঁটি উদ্দীপনা সৃষ্টি করে নতুন উৎপাদন পদ্ধতিতে উত্তরণের একটি ধরণও তৈরী করে। ঋণ ব্যবস্থার এই অস্পষ্ট চরিত্রের জন্যই এর প্রধান প্রবক্তা আইসাক পেরেইর মধ্যে দুই বিপরীত গুণের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়– "ঠক্‌বাজ" এবং "ভবিষ্যদ্বক্তা"।] আজ এত বছর পরও এই ভবিষ্যদ্বানীর বাস্তবতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বিশ্বপুঁজিবাদ।

মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বানীর পর ১৯২৯ সালে সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে একটি "মহামন্দা" সৃষ্টি হয়েছিল। এর মূলে ছিল "অতি উৎপাদন" এর সংকট এবং "স্টক মার্কেটের ভয়াবহ পতন"। যাকে মার্কিন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ্ গ্যালব্রেইথ নাম দিয়েছিলেন "Great Crash". আর ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ লর্ড ম্যানিয়ার্ড কেইনীস বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য কৃত্রিমভাবে হলেও কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে সেজন্য প্রয়োজন হলে "গর্ত খুঁড়ে ও গর্ত বন্ধ করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে"। কেইনীসের সে সময়কার আরেকটি স্মরণীয় উক্তি:-"যদি শিল্পখাত হয় পুকুর আর শেয়ারবাজার হয় বুদ্বুদ, তাহলে অসুবিধা নেই, কিন্তু পরিস্থিতি যদি হয় এর বিপরীত তাহলে মহাবিপদের আশংকা।" এ কথা আজ প্রমাণিত সত্য যে, "পুঁজিবাদের" কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এর উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক ও সামাজিক চরিত্র এবং এর বিপরীতে ভোগের– ক্ষমতার এবং বিলাসিতার ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভবন। পুঁজিবাদ এর আরেক গুচ্ছ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার নামে পরিকল্পনাহীন নৈরাজ্য, সমবেদনাহীন নিষ্ঠুরতা, ফাটকাবাজী এবং নৈতিক অবক্ষয়ের জয়গান। মানব সভ্যতা ও রেঁনেসার জয়গান গেয়ে যে পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছিল সে আজ আপন লোভের কাছে আপনি পরাস্ত হতে বসেছে।

এ কথা ঠিক পুঁজিবাদের শিবিরে যারা অপেক্ষাকৃত উদার ও জ্ঞানী তারা পুঁজিবাদের এসব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন এবং এসব শোধরানোর জন্য কিছু সময়োচিত সংস্কারের প্রস্তাবও তাঁরা নানা সময়ে করেছেন। চীন যেরকম "সোভিয়েত মডেলের" সীমাবদ্ধতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী সময়ে "বাজার সমাজতন্ত্র" পর্যন্ত নেমে এসেছেন এবং এখন পর্যন্ত যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়ে চলেছেন তেমনি পুঁজিবাদী দেশের এসব সংস্কারকরাও চেষ্টা করেছেন পুঁজিবাদের সফল সুসংস্কৃত মডেল

গড়ে তুলতে। স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলি ধনীদের ওপর বিশাল ট্যাক্স বসিয়ে (প্রায় ৪০ শতাংশ) তা দিয়ে রাষ্ট্রিয় কল্যাণ ব্যয় নির্বাহের যে চেষ্টা এ যাবৎ চালিয়ে এসেছেন– তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকান নব্য উদারবাদী অর্থনীতিবীদরা প্রত্যাখান করেছিলেন এবং ৮০'র দশকে সমাজতন্ত্রের সংকটকে পুঁজি করে নব আনন্দে "বাজার মৌলবাদের" দিকেই ঝুঁকেছিলেন। পরবর্তীতে আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বপুঁজিবাদের অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য অনেক দেশই সেই পথেই পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ সেই বিষবৃক্ষের তিক্ত ফল যখন ফলতে শুরু করেছে তখন আমরা শুনতে পাচ্ছি পুঁজিবাদের এক ধরণের "নাকি কান্না"।

তিন

৮০-উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এ বছরের নোবেল বিজয়ী উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান ও অন্যান্যদের নানা টীকা ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরষ্ট্রে 'দক্ষিণপন্থী উদারবাদী'-রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

১৯৮৩-৮৪'র পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আয়-বৈষম্য বাড়তে শুরু করে। (ক্রুগম্যানের মতে ১৯২৯ এর পর থেকে কিছুটা নিউডীলের প্রভাবে আমেরিকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল এবং ১৯৭০ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। যদিও এর প্রকৃত অর্থ এই নয় যে আয় বৈষম্য তখন বৃদ্ধি পায় নি। প্রকৃত পক্ষে তখন মধ্যবিত্তের আয় বাড়লেও ধনীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। ধনবাদের অধীনে "বৈষম্যহীন আয় বৃদ্ধির" একমাত্র স্বল্পকালীন দুটি উদাহরণ হচ্ছে ষাট ও সত্তর দশকের দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান। ১৯২৯ এর পর নিউ-ডীল পলিসি নিয়েও যুক্তরাষ্ট্র সেরকম উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে নি।

* আমেরিকান অর্থনীতিবিদরা এই ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্যের পক্ষে তখন যুক্তি দিয়েছিলেন যে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর প্রবৃদ্ধির জন্য ঐ প্রযুক্তির বাহক বৃহৎ পুঁজিকে এবং তাদের সুশিক্ষিত ম্যানেজারদেরকে এ ধরণের উচ্চ আয়ের প্রণোদোনা দেয়াটা অনিবার্য এবং যুক্তিসিদ্ধ। এটা ছিল সাপ্লাই সাইড অর্থনীতির পুরানো যুক্তি।

* সাপ্লাই সাইড অর্থনীতি প্রসূত উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের ধাক্কার ফলে আমেরিকায় স্বল্প দক্ষ শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে। তাদের বেতনও কমতে শুরু করে। অবশ্য তাতে সত্যিই প্রযুক্তির বিকাশ যারা ঘটিয়েছেন তারা সুবিধা পেয়েছেন কিনা সে সন্দেহ থেকেই যায়।

* তদুপরী মুক্তবাজার নীতির ফলে আমেরিকার বাজারে চীনসহ উন্নয়নশীল দেশ যেভাবে ঢুকে পরে তাতেও শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান শ্রমিকরা চাকুরী হারাতে থাকেন।

* আমেরিকান অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় বিশাল বাণিজ্য ঘাটতির।

* সরকার সুদের হার বাড়িয়ে দিয়ে বিদেশী পুঁজিকে আকৃষ্ট করে এই ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করেন। যেহেতু বড়লোকদের ওপর ট্যাক্স চাপানো সম্ভব হচ্ছিল না সেহেতু বাজেট ঘাটতি মেটানোর আর কোন পথ আমেরিকান সরকারের হাতে ছিল না। এভাবেই আমেরিকান সরকার ট্রেজারী বন্ড বিক্রয়কারী সর্ববৃহৎ ঋণ গ্রহণকারী দেশে পরিণত হল।
* বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধির পেছনে কর আরোপে ব্যর্থতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি কারণ। সেটি হচ্ছে পৃথিবীর ১৩০টি দেশের ৭০০টি সামরিক ঘাঁটির অতিরিক্ত ব্যয়। এটাও কমানো সম্ভব হয় নি আমেরিকার পক্ষে। উপরন্তু "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নাম করে আফগানিস্তান ও তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের এলাকাগুলিতে যুদ্ধের বিস্তার ঘটিয়েছে মার্কিন সরকার। এই যুদ্ধের ফলেও রক্তক্ষরণ ও অর্থক্ষরণ অব্যাহত রয়েছে।
* এমতাবস্থায় বিশাল মার্কিন কর্পোরেশানগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার টিকিয়ে রাখার জন্য অনন্যোপায় হয়ে আমেরিকায় সৃষ্টি করেছেন "আয়হীন ভোগের" এক অদ্ভুৎ কৃষ্টি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় "ক্রেডিট কার্ড" কালচার। এক ডলার পুঁজিকে ভিত্তি করে ৯৭ ডলার ঋণের প্রসার ঘটানো হয়েছে! এখন আমেরিকান অর্থনীতিতে মোট ব্যাংক ঋণের পরিমাণ তাদের জাতীয় আয়ের আড়াইগুণ বেশী।
* মধ্যবিত্ত আমেরিকানদেরও মনে নানা বিজ্ঞাপন প্রচারণার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে পুঁজিবাজারে শেয়ার কিনে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন। "ঋণ করে ঘি খাওয়া" এবং "শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজী" এই দুই এর প্রভাবে প্রথম দিকে অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় একটি কৃত্রিম রমরমা ভাব। যাকে কীনসের ভাষায় বলা যায় যে "পুকুরের" চেয়ে "পুকুরের উপরের বুদ্বুদই" বড় হয়ে যায়। এটা আসলে প্রথম থেকেই স্থায়ী কোন ব্যাপার ছিল না।

২০০৮ সালে যখন এই বুদ্বুদ অনিবার্য ভাবে ফেটে যায় তখন সারা বিশ্বে "ডমিনো" এফেক্টের মত অর্থনৈতিক সংকট ধীরে ধীরে একের পর এক ছড়িয়ে যেতে থাকে। সেই সংকট এখনো অব্যাহত আছে। তা কতদিন স্থায়ী হবে, কত গভীর হবে, মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি না, সাময়িকভাবে আগুন নিভানোর পথ কি? ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এখন সারা বিশ্বে চলছে তুমুল তর্ক-বিতর্ক। যেহেতু আমেরিকায় চলেছে তখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তাই সেখানেই বিতর্কটা জমেছে সবচেয়ে বেশী। আমরা এখনই এসব প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোন উত্তর দিতে পারবো না। তবে সংকট যে খুবই গভীর এবং এই সুযোগে পুঁজিবাদ যে ক্রমশ: উলঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার ভেতরেই যে নানা দল-উপদল ও বিভেদের সৃষ্টি হবে সে কথা আমরা সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারি। তার লক্ষণও ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে এই গভীর সংকটের প্রধান উপাদানগুলো আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান স্যাম ওয়েস্ট চিহ্নিত করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়:

ক) গভীর আয় বৈষম্য।

খ) কৃত্রিম বিনিয়োগ বেলুনের আকস্মিক চুপসে যাওয়া।
গ) অবহনযোগ্য ঋণের বোঝা।
ঘ) ঋণ-বাজারের পরিপূর্ণ স্থবিরতা।
ঙ) সামাজিক খাতে ব্যয়ের তীব্র সংকোচন।
চ) অনিরাপদ পণ্যের উৎপাদন।

পল ক্রুগম্যানের মতে ৮০ ও ৯০ দশকে আমেরিকায় যে ১ শতাংশ এলিটের আয় বেড়েছে তা "ন্যায়সঙ্গত" বৃদ্ধি ছিল না। এরা "এন্টারপ্রেনার" বা "উদ্যোক্তা" ছিলেন না, এরা ছিলেন বিশাল আর্থিক সম্পত্তির মালিক, "শেয়ার পুঁজির" মালিক এবং মূলত: খাজনা ভোগী" পুঁজিপতি। লেনিনের ভাষায় "কুপন ক্যাপিটালিস্ট"। এরাই আমেরিকান অর্থনীতির ও রাজনীতির হর্তা-কর্তায় পরিণত হন। তাদেরকে সহায়তা করেছিলেন "চার্চ" এবং "নব্য ফ্যাসিস্ত বর্ণ-বৈষম্যবাদী সংগঠন সমূহ"। এরই ফলে আমেরিকান গণতন্ত্র বর্তমানে তার উদার বৈশিষ্ট্যগুলিই হারাতে বসেছে। যে গণতন্ত্রের কথা বলে আমেরিকানরা এতকাল সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে সক্ষম ও সফল হয়েছিলেন সে-গণতন্ত্র কিভাবে বিপন্ন হোল সে সম্পর্কে পল ক্রুগম্যান তাঁর "The Conscience of a Liberal" গ্রন্থে লিখেছেন, "এই রক্ষণশীল আন্দোলনের প্রধান রসদ হোল টাকা। এই টাকা যোগায় কতিপয় চরম ধনী ব্যক্তি ও কিছু কর্পোরেশন। এরাই বৈষম্য বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত আয়ে কর মওকুফের সুবিধা নিয়ে অসীম ক্ষমতা অর্জন করেছে। এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা গ্রোভার নরকুইস্ট একদা ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আমেরিকাকে টেডি রজভেল্টের আগের সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান অর্থাৎ সেই বর্বর সুবিধাবাদের কালে"। অবশ্য পল ক্রুগম্যান এও আশা করেছেন যে আগামী নির্বাচনে বারাক ওবামার নেতৃত্বে নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকানরা ক্ষমতাসীন হয়ে রুজভেল্টের "পুরানো নিউ ডীল কর্মসূচীর" পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন। যাদের মনে আছে তারা জানেন যে রুজভেল্ট ১৯২৯ এর মহামন্দার পর আমেরিকায় "সামাজিক নিরাপত্তার জাল" প্রসারিত করেছিলেন, "আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির" সর্বাধিক প্রসার তখন ঘটেছিল এবং রুজভেল্টের বিখ্যাত 'মটো' ছিল, " The only thing to fear is fear". "এক মাত্র ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে ভয়"। মনে হচ্ছে এবারের সংকটে পল ক্রুগম্যানের আশা "বারাক ওবামা হবেন আগামী দিনের "নির্ভীক সংস্কারবাদী"। এই প্রয়োজনীয় সংস্কারের ধরণ বর্ণনা করতে গিয়ে পল ক্রুগম্যান লিখেছেন: "এখন প্রশ্ন হলো, এই আসন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাজ কি? আমার মতে তাদের প্রথম কাজ হলো আপসহীনভাবে উদারনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার জালকে প্রসারিত করা। সেটাই হবে এক নতুন 'নয়া বন্দবস্ত' (নিউ ডীল)। একুশ শতকের সেই সামাজিক নিরাপত্তার সমার্থক হলো সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা। বেশির ভাগ অগ্রসর দেশ ইতোমধ্যে তা করে

ফেলেছে। সেখানে পৌঁছানোর জন্য আমাদের দরকার কোথায় আমরা ছিলাম তার দিকে ফিরে দেখা"।

(ফারুক ওয়াসিফ অনূদিত, পল ক্রুগম্যান লিখিত গ্রন্থের " যে আমেরিকা আমরা চেয়েছিলাম" শীর্ষক ভূমিকা থেকে উধৃত।)

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট নতুন নয়। সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ বাঁচার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের আয়োজন করবে– এটাও নতুন কোন ঘটনা নয়। তবে এই হস্তক্ষেপের প্রকৃতির ওপর মূলত: নির্ভর করবে এই সংকটের ঝড়টা কাদের ওপর বয়ে যাবে। সংকট সৃষ্টিকারী অতি লোভী ও দায়িত্বহীন পুঁজিপতিরা সর্বদাই চাইবেন সংকটের বোঝাটা যাতে বেশী বেশী করে গরীব মানুষের ওপরেই পরে– এবারো আমেরিকান অর্থনীতিতে তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। অনুষ্ঠিতব্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর বিতর্কের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টা প্রতিদিন আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠ্ছে।

"আমেরিকান রাষ্ট্রের মোট ঋণের ৪৪ শতাংশই এখন আসে বিদেশ থেকে অর্থাৎ চীন, সৌদি আরব, জাপান ও যুক্তরাজ্য থেকে। এই বিদেশী ঋণের পরিমাণ হচ্ছে বর্তমানে ৫১৭.২ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৪০৫ বিলিয়ন ডলার চীনের কাছে ঋণ। একটি সত্য আমেরিকানদের কষ্ট হলেও বুঝতে হবে যে, পৃথিবীতে একাধিপত্য করার আমেরিকান স্বপ্ন আজ শেষ হয়ে সুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আগামী শতাব্দী কোনভাবেই আর আমেরিকান শতাব্দী হিসাবে পরিচিত হবে না। মৌলিক ধরণের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া শুধু 'পরিবর্তনের শ্লোগান দিয়ে' বারাক ওবামার পক্ষেও সম্ভব হবে না অধ:পতিত আমেরিকাকে পুনরুদ্ধার করা।

"বারাক ওবামা" একটি ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফসল। একে না বুঝলে আমেরিকান পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎকে যেমন বোঝা যাবে না তেমনি আবার আমেরিকান পুঁজিবাদকে না বুঝলে বারাক ওবামাকে বোঝা যাবে না। আমেরিকান পুঁজিবাদের নানা ঐতিহাসিক তথ্য-বিবরণী ও সাম্প্রতিক সংকটের সংক্ষিপ্ত চালচিত্র আগের অনুচ্ছেদগুলিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এইবার সংক্ষেপে "বারাক ওবামার" গ্রন্থ "The Andacity of Hope" থেকে একটি উধৃতির সাহায্যে 'বারাক ওবামার' রাজনৈতিক মানসের দোদুল্যমান দিক্ট আমি উন্মোচিত করার চেষ্টা করবো। তিনি লিখ্ছেন: "আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছি রিগ্যানের 'প্রেসিডেন্সির' সময়। আমি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগে অধ্যয়ন করছিলাম। এবং পরবর্তী সময়ে শিকাগোতে সমাজ সংগঠক (Community organizer) হিসাবে কাজ করেছি – তখনকার অনেক ডেমোক্র্যাট এর মত আমিও তৃতীয় বিশ্বের প্রতি রিগ্যানের অনেক নীতি নিয়ে বিলাপ করতাম। তার প্রশাসন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী সরকারকে সমর্থন দিয়েছে, এল সালভাদরের ঘাতক বাহিনীকে অর্থায়ন করেছে, ক্ষুদ্র অসহায়

গ্রানাডাকে দখল করে নিয়েছে। যত বেশি করে আমি 'নিউক্লিয়ার পলিসি' নিয়ে পড়াশুনা করেছি ততই আমি উপলব্ধি করেছি যে "তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচীটি সুবিবেচনা প্রসূত কোন পরিকল্পনা নয়। রিগ্যানের অত্যন্ত লম্বা-চওড়া বাৎচিত এর সঙ্গে ইরান-কণ্ট্রা কেলেংকারীর অশ্লীল ফারাক দেখে আমি হতবাক হয়ে পড়েছি"। *(বারাক ওবামা, দ্য অডেসিটি অফ হোপ, পৃ:- ২৮৯)*। উপরিউক্ত সবকিছুই হচ্ছে তরুণ বারাক ওবামার চিন্তার একটি বিশেষ দিক। কিন্তু পাশাপাশি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি অপেক্ষাকৃত ম্যাচিউর ওবামার আরেকটি দিক্ হচ্ছে- "কখনো কখনো আমার বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে আমি নিজেকে এক অদ্ভুত অবস্থানে খুঁজে পেয়েছি। দেখা গেছে সেখানে কিছু কিছু পয়েন্টে আমি রিগ্যানের বিশ্ববীক্ষার পক্ষে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছি। আমি বুঝতে অক্ষম "লৌহ যবনিকার অন্তরালে" মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় প্রগতিশীলরা কেন অতখানি উদ্বিগ্ন হন্ না যতখানি তারা উদ্বিগ্ন হন চিলিতে চালানো বর্বরতা সম্পর্কে। আমি বুঝতে অক্ষম কেন পৃথিবীর তাবৎ দারিদ্র্যের দায়ভার এককভাবে আমেরিকান বহুজাতিক কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিনিময় হারের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়ে থাকে, কেউই তৃতীয় বিশ্বের দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের তাদের জনগণের অর্থ চুরি করার জন্য জোর করে বাধ্য করে নি, রিগ্যানের সামরিক বাজেটের আয়তন নিয়ে আমার তর্ক আছে, কিন্তু আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর সোভিয়েত সামরিক শক্তির চেয়ে আমেরিকান সামরিক শক্তিকে উন্নততর করার সিদ্ধান্তটিও বেশ যুক্তিসঙ্গত বলে আমার মনে হয়। নিজের দেশ নিয়ে গর্ব, নিজ দেশের সামরিক বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা, আমাদের সীমানার বাইরের বিপদ সম্পর্কে একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর সচেতনতা, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে সহজ কোন সমতা ছিল না– এসব কিছুর ব্যাপারেই আমার সঙ্গে রিগ্যানের কোন ঝগড়া নেই। এবং যখন বার্লিন প্রাচীর ধ্বসে পড়লো, তখন বুড়ো রিগ্যানকে অবশ্যই তার প্রাপ্যটুকু আমাকে দিতে হবে– যদিও কখনোই আমি তাকে আমার ভোটটা দিই নি।"
(প্রান্তক্ত- পৃ:- ২৮৯)

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 'বারাক ওবামা' আমেরিকান আধিপত্যের প্রশ্নে যথেষ্টই জাতীয়তাবাদী এবং সে জন্য আমেরিকান অর্থনীতিতে ধস এবং পরিণতিতে যে ধরণের সংস্কার আসতে পারে তাতে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ ভাবে উপকৃত হওয়া বা কৃপা পাবার কোন সুযোগ নেই। যেটুকু সুবিধা বা অসুবিধা আমরা পাবো তার সবটাই নির্ভর করবে আমাদের নিজেদের নীতি-কৌশল ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ওপর।

চার

এখন মার্কিন অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কর্মসূচীর প্রশ্নে আমেরিকায় দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে তীব্র বিতর্ক চলছে। ম্যাককেইন ও বুশের পরিকল্পনাকে নাম দেয়া হয়েছে

"বেইল-আউট" পরিকল্পনা। এর প্রধান বক্তব্য হচ্ছে আমেরিকান কর দাতাদের কাছ থেকে বা অন্য কোনভাবে ৭০ হাজার কোটি টাকা আগে সংগ্রহ করতে হবে। তারপর তা ব্যয় করতে হবে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণগুলি ক্রয় করার জন্য অথবা দেউলিয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার কিনে নেয়ার জন্য। এই পরিকল্পনার তীব্র সমালোচকরা বলছেন যে এর অর্থ হচ্ছে গরীব করদাতার পয়সা দিয়ে দুস্কৃতকারী ধনী কোম্পানীগুলিকে রক্ষা করা।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিটজের মতে "ঝুকিপূর্ণ ঋণ কিনে নেয়ার" পরিকল্পনাটি 'ভুলে ভরা'। স্টিগলিটজ প্রশ্ন তুলেছেন: এসব সম্পত্তির মূল্য ঠিক করা হবে কিসের ভিত্তিতে, তা কি ওয়াল স্ট্রীটের যে বিশেষজ্ঞরা এই সংকট বাঁধিয়েছেন তাঁদের দিয়েই করা হবে। অবস্থাটা হলো মাথা বাঁচলে লেজ বাঁচে না গোছের। তবে যাই করা হোক্ না কেন, যে করদাতাদের টাকায় ওয়াল স্ট্রীটের ফট্কা পুঁজির উদ্ধার অভিযান চলছে তাদের ক্ষতি সুনিশ্চিত।" *(নিউ স্টেটসম্যান, ব্রিটেন, প্রথম আলো, ২০ শে অক্টোবর সংখ্যায় অনুদিত ও পুন:মুদ্রিত)* স্টীগলিটজের মতে সরাসরি ব্যাংকগুলিতে পুঁজি ঢেলে রাষ্ট্র কর্তৃক শেয়ার কিনে সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে অর্থনীতিকে রক্ষার চেষ্টাটাই অধিকতর সঠিক হবে। মার্কিন রক্ষণশীল লবিও এখন বাধ্য হয়ে বলছেন "এভাবে ব্যাংকের শেয়ার কেনাটা অবশ্যই আমাদের নব্য উদারবাদী নীতি তথা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শূন্যতার নীতির বিরুদ্ধে যায়– কিন্তু পছন্দ না হলেও তা আমাদের করতে হচ্ছে বা হবে।" আর রক্ষণশীল পত্রিকা দী ইকনমিস্ট লিখেছে এটা হচ্ছে 'ক্ষতির রাষ্ট্রিয়করণ' এবং 'লাভের ব্যক্তিগতকরণ' এর নীতি।

উদ্ধার কর্মসূচীর আরো যেসব দুর্বল ও বিতর্কিত দিক রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ৭০ হাজার কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহের কৌশল সংক্রান্ত। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বিতর্কে ওবামা বলেছেন তিনি ৯৫ শতাংশ আমেরিকানদের ওপর কর বসাতে অনিচ্ছুক। ৫ শতাংশ ধনীদের থেকে এই টাকাটা সংগ্রহ করতে হবে অথবা বাইরে ট্রেজারি বন্ড বিক্রী করেও এটা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে এখন পৃথিবীতে অন্য দেশগুলি ডলার কেনার চেয়ে ডলার বিক্রী করতেই বেশী আগ্রহী। ডলারের পতন হচ্ছে বহু জায়গায়। এমনকি বাংলাদেশেও! এই অবস্থায় অনেক ডলারের মালিক চীন যদি সাড়া না দেয় তাহলে আমেরিকার পক্ষে বাইরে থেকে ডলার যোগাড় করা খুবই কঠিন হবে। চীনকে সম্প্রতি খোদ আমেরিকান ব্যাংক কিনে নিতেও বলা হয়েছিল– কিন্তু চীনের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক তা কিন্‌তে রাজী হয় নি। বাইরে থেকে ধার না পেলে, বিনিয়োগ না আসলে তখন করের মাধ্যমেই ৭০ হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরী করতে হবে। কিন্তু যে ম্যাককেইন বলেছেন "আসুন আমরা যেন কারো জন্যই কর না বাড়াই।" বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের কোন চাপ দিতে বা তাদের থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতে ম্যাককেইন একেবারেই প্রস্তুত নন। তার মতে ধনীদের সম্পদ ছড়িয়ে দিলে

(Spread out) তার উৎপাদনশীলতা কমে যাবে, ফলে শেষ পর্যন্ত গরীব লোকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আবার সেই সাপ্লাই গাইড অর্থনীতির পুরানো যুক্তি।

এ কথা সত্য যে মার্কিন ব্যাংকগুলিকে দ্রুত উদ্ধার করা না গেলে, ভোক্তাদের বিশ্বাস ফিড়িয়ে এনে বাজারে তাদের ব্যয় প্রবণতা স্বাভাবিক মাত্রায় উন্নীত করা না গেলে, বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস ফিড়িয়ে না আনা গেলে এবং সর্বোপরি ব্যাংকের ঋণ-প্রবাহ পুনরায় চালু না করা গেলে আর্থিক বাজারের এই সংকট শুধু আর্থিক বাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, প্রকৃত উৎপাদনেও এই সংকট ছড়িয়ে পড়বে। তখন মন্দা-বেকারত্ব এবং কারখানা বন্ধের হিড়িক পরে যাবে। অর্থনীতিবিদ্‌দের ভাষায় আমেরিকান অর্থনীতির সংগে সংশ্লিষ্ট বহু প্রতিষ্ঠানে এই মন্দা আঘাত হান্‌বে এবং একধরনের "চেইন এফেক্ট' বা "মন্দার মাল্টিপ্লায়ার" সৃষ্টি হবে। এটাই এখন সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয়।

সাধারণভাবে অর্থনীতিবিদ্‌রা একমত যে এবারের সংকট উন্নত বিশ্বকেই অধিকতর আঘাত হানতে চলেছে। কারণ এখন পর্যন্ত উন্নত বিশ্বের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পৃক্তি অনেক বেশী নিবিড় এবং ঘনিষ্ট। ফলে জার্মানি, ব্রিটেন, আইসল্যান্ড, ইউরোপের অন্যান্য দেশ ইতোমধ্যেই সংকটের ধাক্কায় আক্রান্ত হয়ে পরেছে। যারা যতবেশী দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বিদেশী আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তারা এখন ততবেশী সমস্যায় পরেছেন। সারা বিশ্বে এরকম দৈত্যাকার ২০টি ব্যাংক বর্তমানে সংকটে পতিত হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে জড়িত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক খাতও এখন বিপদগ্রস্ত হয়ে পরেছে। আই এম এফের সর্বশেষ হিসাবানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুধু নয় সমগ্র উন্নত বিশ্বের প্রবৃদ্ধির হার এ বছর শূন্যে বা নেগেটিভে নেমে যেতে পারে। উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রবৃদ্ধির হারও কমবে। বিশেষ করে তাদের রপ্তানী খাতের প্রবৃদ্ধি, বাইরের থেকে পুঁজির প্রবাহ, বাইরে তাদের শ্রম নিয়োগ, বিদেশী সাহায্য প্রাপ্তি এগুলির ওপর এই সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কোন্ দেশে এগুলির প্রভাব কতটুকু হবে এবং তারা কে কতটুকু পূর্বপ্রস্তুতি ও বিচক্ষণতাসহ এসব ঝুঁকির মোকাবেলা করবেন তার ওপরই সর্বশেষ চূড়ান্ত ফলাফলটি নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্বের বাঁচার একটি রাস্তা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে সবরকম পারস্পরিক আন্ত:-সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। বস্তুত: এখনও উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্ধেকের বেশী বাণিজ্য তাদের নিজেদের মধ্যেই চলে থাকে এবং সম্ভবত: সে জন্যই তারা এখনও পর্যন্ত সংকটে ভেসে যায় নি।

পাঁচ

যদিও একটি বিশাল দৈত্যের সঙ্গে ক্ষুদ্র একটি বামুন অর্থনীতির কোন তুলনা বৈজ্ঞানিকভাবে অসঙ্গত তবু আমি এই রচনার এক নম্বর পরিশিষ্টে বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং বিশাল আমেরিকান অর্থনীতির নির্বাচিত কিছু সামুষ্টিক (Macro)

সূচকের তুলনামূলক তথ্যাবলী উত্থাপন করছি। এই পর্যায়ে তিনটি তালিকায় যে সব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে সেগুলোর উৎস আন্তর্জাতিক দুটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক এবং ইউএনডিপি। বিশ্বব্যাংক প্রতিবছর 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট' প্রকাশ করে থাকে। ইউএনডিপি প্রতি বছর এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকাশ করে থাকে 'হিউমান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট'। বলা বাহুল্য প্রথম প্রতিষ্ঠানটি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল এবং অধিকতর 'বাজার' ও 'ব্যক্তিমালিকানার' ভক্ত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি মাহবুবুল হক ও অমর্ত্য-সেনের 'মানব উন্নয়ন' তত্ত্বে বিশ্বাসী। বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এর পার্থক্য যাই থাকুক না কেন এদের তথ্যকে এ্যাকাডেমিক মহল সাধারণভাবে গ্রহণ করেই তাদের তত্ত্ব ও পর্যালোচনাগুলো প্রনয়ণ করে থাকেন কারণ এদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও ক্ষমতার কোন বিকল্প এখন পর্যন্ত বিশ্বে তৈরি হয় নি।

এক নম্বর তালিকায় আমি আমেরিকান অর্থনীতি ও বাংলাদেশের অর্থনীতির কতিপয় নির্বাচিত সামুষ্টিক সূচকের চিত্র তুলে ধরেছি। এতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় আমেরিকার জনসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে সামান্য বেশি। কিন্তু আমেরিকার মোট জাতীয় আয় বাংলাদেশের তুলনায় ১৯২ গুণ বেশি। স্বাভাবিকভাবেই তাই মার্কিন নাগরিকদের গড় মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের নাগরিকদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি– প্রায় ৯৪ গুণ বেশি! ২০০৬ সালে বাংলাদেশের একজন নাগরিক গড়ে যেখানে আয় করেছেন মাত্র ৪৮০ ডলার সেখানে মার্কিনী একজন নাগরিক আয় করেছেন ৪৪৯৭০ ডলার। বাংলাদেশে রয়েছে তীব্র ভূমি স্বল্পতা পক্ষান্তরে আমেরিকান ভূমি- জনসংখ্যা অনুপাতে অনেক অনুকূল। আমেরিকায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করেন মাত্র ৩৩ জন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে বাস করেন ১১০৯ জন। অবশ্য এই [পরিসংখ্যান ২০০৬] । যেহেতু বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আমেরিকার প্রায় দ্বিগুণ সেহেতু ভূমি- জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিবছর বাংলাদেশের জন্য আরো প্রতিকূল হচ্ছে। অবশ্য বাংলাদেশের নীট মাইগ্রেশান বা বহির্গমন যেহেতু ইতিবাচক এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে নেতিবাচক সেহেতু এদিক থেকে আমরা আবার কিছুটা স্বস্তিতে আছি। কিন্তু এরপরও ভূমির স্বল্পতা আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। তালিকা 'এক' থেকে এটাও দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব ২০ শতাংশ কিন্তু আমেরিকায় তা মাত্র ১ শতাংশ। আমেরিকার অর্থনীতিতে সেবা ও শিশু ক্ষেত্রের অবদান যথাক্রমে ৭৭ শতাংশ এবং ২২ শতাংশ কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে সেই অবদান যথাক্রমে ৫২ শতাংশ এবং ২৮ শতাংশ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকান অর্থনীতির প্রধান খাত হচ্ছে 'সেবা খাত' এবং তার মধ্যেই অন্যতম খাত আর্থিক খাতেই সংকটের সূচনা হয়েছে। এদিক দিয়েও বাংলাদেশের একটু স্বস্তি পাওয়ার আছে। যেহেতু তাদের সেবা খাতের আয়তন তুলনামূলকভাবে কম এবং তাতে যে আর্থিক খাত আছে তা কম-বেশি insulated অর্থাৎ সংকটগ্রস্ত আমেরিকান আর্থিক খাতের সঙ্গে ততটা সম্পৃক্ত নয় সেহেতু সংকটের

আমদানী সহসাই এই খাতে ঘটবে না। আমাদের কৃষিখাতও এদিক থেকে নিরাপদ। আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় হচ্ছে আমদানি-রপ্তানির বিষয়টি এবং বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদিশক বিনিয়োগের বিষয়টি। নিঃসন্দেহে বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগ কিছুটা কমার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এটা এখনই হবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের তত্ত্বধায়ক সরকারের আমলে অর্থ-উপদেষ্টা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এবছর প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্য গত সকল সময়ের পরিমাণ অতিক্রম করে গেছে। অবশ্য প্রতিশ্রুতি ও প্রাপ্তির মধ্যে সবসময়ই ফাঁক থেকে যায়। তবে বৈদেশিক বিনিয়োগের ধাক্কাও আমরা কিছুটা সামলাতে পারবো যদি আমরা দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে পারি এবং অবকাঠামোকে দক্ষ ও উন্নত করতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য উন্নত বিশ্বের বিনিয়োগের বদলে অধিক মনোযোগ দিতে হবে আন্তঃউন্নয়নশীল দেশের বিনিয়োগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রেও এই একইভাবে 'দক্ষিণের দিকে ফিরে দেখার' দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য যোগাযোগ এবং 'এনার্জি' নিয়ে কি কি সহযোগিতা করা সম্ভব তা নিয়ে আমাদের জরুরি ভাবে ভাবতে হবে। তবে এসব প্রক্রিয়ায় ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ যাতে প্রাধান্য না পায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলোর জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ভারতীয় শাসক শ্রেণীকেও একবিংশ শতকের অর্থনীতিতে স্বীয় ভূমিকা ও অগ্রগতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়ে 'এশিয়ার জন্য এশিয়া' এবং চীন ও রাশিয়াসহ 'সাংহাই কো-অপারেশন' এর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। সম্ভবতঃ বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্তমান সংকট পুঁজিবাদী বিশ্বের নতুন শক্তি বিন্যাস ঘটাতে চলেছে। সেই আশা এবং সম্ভাবনা এখন বিদ্যমান।

দুই নম্বর তালিকায় আমরা মানব-উন্নয়ন সূচকের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তথ্য তুলে ধরেছি। তবে সকল গড় পরিসংখ্যানের মধ্যে যে ফাঁকি থাকে তা এর মধ্যেও আছে এবং ইউএনডিপি দরিদ্রদের জন্য আলাদা মানবসূচকও তৈরি করার প্রয়াস নিয়েছিলেন তবু আপাততঃ আমরা সাধারণ গড় পরিসংখ্যানের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। দুই নম্বর তালিকা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় আয় যদিও আমেরিকার গড় আয়ের প্রায় ১০০ ভাগের এক ভাগ, কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচকের মূল্য হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ·৫৫ এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে ·৯৫। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক আমেরিকার সূচকের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে আর্থিক প্রাচুর্যের দিক থেকে আমরা আমেরিকার তুলনায় অনেক নিচে আছি, কিন্তু মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা তুলনামুলকভাবে অত পিছিয়ে নেই। আসলে শ্রীলঙ্কা, কিউবা, ভিয়েতনাম ইত্যাদি যেসব অর্থনীতিতে 'ব্যক্তি' ও 'বাজারকে' সব কিছু ছেড়ে দেয়া হয়নি সেসব দেশেও তুলনামূলকভাবে মানব উন্নয়ন সূচক আয়-সূচকের তুলনায় আরো অনেক বেশি অগ্রসর থাকতে দেখা যায়। এই বিষয়টি অ্যাকাডেমিক

মহলে প্রথম তুলে ধরেছিলেন অধ্যাপক এ.কে সেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সামাজিক খাগুলোতে সেবা প্রদানকে এসব দেশ আমেরিকার মত 'বাজার' ও 'ব্যক্তি' খাতের হাতে ছেড়ে দেয় নি। বাংলাদেশ যদি ইতোমধ্যে বিপদগ্রস্ত আমেরিকান নব্য-উদারবাদী আদর্শটি ত্যাগ করে 'মানব উন্নয়নকে' প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও একে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে নেয় তাহলে ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি আরো ত্বরান্বিত হতে পারে।

তিন নম্বর তালিকায় তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন সামুষ্টিক চলকের তুলনামূলক প্রবৃদ্ধির হার। জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বভাবিক ভাবেই ক্ষুদ্র অর্থনীতি বলে (অর্থাৎ ভিত্তিটা ছোট বলে!) অনেক এগিয়ে আছে। তবে ২০০০-০৬ কাল পর্বে বাংলাদেশে জিডিপি ডিফ্লেটর বা নামান্তরে মূদ্রাস্ফীতির হার ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। এটা অবশ্য জনজীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তবে এখন এটা কমার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে!

তিন নম্বর তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার আমেরিকার বেকারত্বের হারের চেয়ে বর্তমানে কম। অবশ্য আমরা অর্ধ-বেকারকে হিসাবে নিলে এবং সংকট উত্তর আমেরিকান বেকারত্বের সর্বশেষ পরিসংখ্যানকে নিয়ে তুলনা করলে অবস্থা কী দাঁড়াবে তা বলা কঠিন। তবে আমেরিকার পরিস্থিতি এখনো ১৯২৯ সালের অবস্থায় পৌঁছায় নি যখন বেকারত্বের গড় হার দাঁড়িয়েছিল ২৫ শতাংশ এবং 'কালদের' মধ্যে যা ছিল ৫০ শতাংশের সমান। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আমেরিকান অর্থনীতিতে 'আয় বৈষম্য' বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র ছিল এবং এখনো আছে। তালিকায় দেখা যাচ্ছে আমেরিকানদের উচ্চতম ১০ শতাংশ এবং নিম্নতম ১০ শতাংশ উপার্জনকারীর আয়ের অনুপাত হচ্ছে প্রায় ১৬ পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সেই অনুপাতটি হচ্ছে ৮। এই ত্যথটি অবশ্য পুরানো এবং উভয় দেশেই সম্ভবত আয় বৈষম্যের চিত্রটি আরো প্রতিকূল হয়েছে। তবে সংকট পরবর্তী আমেরিকার আয়-বৈষম্যের তথ্য নিয়ে এবং আমাদের সর্বশেষ তথ্যের সঙ্গে তুলনা করলে অবস্থা কী দাঁড়ায় সেটি পরবর্তী সময়ে দেখতে হবে।

তবে এত কিছুর পরেও আমেরিকায় সরকারি শিক্ষা ব্যয়ের অনুপাত দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। তবে লক্ষণীয় হচ্ছে যে ১৯৯০-২০০৫ কালপর্বে আমেরিকায় এই সরকারি ব্যয় অনুপাত ৫.১ শতাংশ থেকে মাত্র ৫.৯ শতাংশে উপনীত হয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে তা ১.৫ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারি শিক্ষা ব্যয় আমেরিকার সাম্প্রতিক নির্বাচনে এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুও বটে।

সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমেরিকায় অনুপাতটি ৪.৩ শতাংশ থেকে ৪.১ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশে তা ১ শতাংশে স্থির রয়েছে। তবে এখানেও অনিশ্চিয়তা বিদ্যমান। আমেরিকা সংকট উত্তরণের জন্য যুদ্ধের পথে যদি পা বাড়ায়

যার সম্ভাবনা কম বলেই মনে হচ্ছে তাহলে সেখানে এই অনুপাত আরো বৃদ্ধি পাবে। আর বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত হলে অথবা গণতান্ত্রিক শক্তির আড়ালে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে এই অনুপাতটি আর স্থীর থাকবে না। তাই এক্ষেত্রে উভয় দেশেই ক্ষুদ্র একটি আশংকা ও অনিশ্চিতি থেকেই যাচ্ছে।

নিঃসন্দেহে যে দুটি সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আমেরিকার তুলনায় অনেক নিরাপদ তা হচ্ছে কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেনস্ বা চলতি লেনদেনের ঘাটতি এবং ব্যাংক ঋণের সূচক। বাংলাদেশে চলতি লেনদেনের ঘাটতি হচ্ছে জিডিপি-র ২.৮ শতাংশ। কিন্তু আমেরিকায় তা ৬.৪৮ শতাংশ। বাংলাদেশে ব্যাংক ঋণের অনুপাত হচ্ছে জিডিপি-র ৫৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে আমেরিকায় এই অনুপাত হচ্ছে ২৩০ শতাংশ!

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সংকটের সংক্রমণের প্রধান দুইটি 'ট্রান্সমিশন চ্যানেল' হচ্ছে আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে তার রপ্তানির মাত্রা বিশেষত পোশাক রপ্তানির মাত্রা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাজরে পাঠানো শ্রমিকদের 'রেমিট্যান্স' বা উপার্জনের মাত্রা। অর্থনীতিবিদরা আশংকা প্রকাশ করেছেন যে আমেরিকা-ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্যে ধীরে ধীরে 'মন্দা' নেমে আসলে তখন তাদের সকল প্রকার দ্রব্য ও সেবার চাহিদা হ্রাস পাবে। তখন আমাদের রপ্তানি পণ্য বিশেষত পোষাক শিল্পের বাজার সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যেও যদি শ্রমিক চাহিদা হ্রাস পায় তাহলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎস (রপ্তানি বা বিদেশি সাহয্যের চেয়েও যা অধিকতর গুত্ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বর্তমানে) সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। এর বিপরীতে যুক্তি হচ্ছে– প্রথমত: আমাদের অধিকাংশ পণ্য হচ্ছে শ্রমঘন এবং কমমূল্যের। বিশেষত: যে ধরনের পোশাক আমরা রপ্তানি করি তা এতই প্রয়োজনীয় যে একদম না কিনলে ক্রেতাদের চলবে না। অর্থাৎ এদের চাহিদা আমেরিকা ও ইউরোপে অনেকখানি অনমনীয়। তদুপরি প্রতিযোগিতায় আমরা বর্তমানে যাদের সঙ্গে লড়ছি (চীন ও ভিয়েতনাম) তাদের তুলনায় আমাদের শ্রমিকদের মজুরী হচ্ছে ৫০-৭৫ শতংশ কম। সুতরাং আমরা যদি আমাদের শিল্পখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে পারি (সে জন্য মালিকদেরও কিছুটা লোভ সামলে এমন নীতি নিতে হবে যেখানে কম মুনাফা কিন্তু বেশি বিক্রির মাধ্যমে মোট মুনাফা বৃদ্ধি সম্ভব হবে!) এবং শিল্পখাতে পর্যাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারি তাহলে আমাদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। বরং ঝুঁকিটা সুযোগে পরিণত হতে পারে। অর্থাৎ তখন জাপানসহ নতুন নতুন বাজারও দখল করে নেয়া সম্ভব হতে পারে।

রেমিট্যান্স প্রসঙ্গে পাল্টা যুক্তি হচ্ছে যে, রেমিটেন্সের মাত্রা ততক্ষণ কমবে না যতক্ষণ মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম চাহিদা না কমবে। এ ব্যাপারে অবশ্য পূর্ণাঙ্গ কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে এখন পর্যন্ত 'রেমিটেন্সের' যে গতিবিধি আমরা লক্ষ্য করছি তাতে এখনই চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ অনেকেই দেখছেন না।

আমি প্রবন্ধের শুরুতে একবার উল্লেখ করেছিলাম 'Facts are very stubborn' (সত্য খুবই শক্তিশালী)। সুতরাং আসুন আমরা বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি, মোট

রপ্তানি এবং রেমিটেন্সের মাত্রা নিয়ে যেসব প্রকৃত তথ্য আমাদের হাতে আছে– তার দিকে দৃষ্টি ফেরাই। পরিশিষ্ট-২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে একটি তালিকা তুলে ধরছি। তাতে কী দেখা যাচ্ছে? আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০০৭ এর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত আমাদের পোশাক শিল্পের রাপ্তানি মাত্রা যা ছিল, ২০০৮ এর জানুয়ারি-জুলাই পর্যন্ত প্রতি মাসে সেই রপ্তানি মাত্রা বেশি হয়েছে। তবে গড়ে সামগ্রিকভাবে ২০০৬ অর্থবছরে তুলনায় ২০০৭ অর্থবছরের এই খাতে রপ্তানির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ শতাংশ। একই তালিকায় প্রদত্ত সমগ্র রপ্তানিও আমরা দেখতে পাচ্ছি চলতি বছর প্রতি মাসে পূর্ববর্তী বছরের আগের মাসের তুলনায় বেশি হয়েছে এবং গড়ে সামগ্রিকভাবে বেড়েছে ৯.৩৩ শতাংশ। এবার রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। এখানেও আমরা লক্ষ্য করছি ২০০৭ এর জানুয়ারি-জুলাই কালপর্বের তুলনায় ২০০৮ এর জানুয়ারি-জুলাই কালপর্বে রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৫১ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিক অর্থবছর ২০০৬-০৭ এর তুলনায় সামগ্রিক অর্থবছর ২০০৭-০৮ এ এই বৃদ্ধির হার ৩১ শতাংশ। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ২০০৮ এর জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির পোশাক শিল্প খাতে ও প্রবাসি শ্রমিকখাতে সংকটের তেমন কোনো উত্তাপ অনুভব করেনি। বরঞ্চ সম্মানজনক ইতিবাচক প্রবৃদ্ধিই অর্জন করেছে।

তাহলে কি আমাদের আত্মসন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ রয়েছে? তা মোটেও সত্য নয়। আমাদের সামনে প্রাথমিক যে সব চ্যালেঞ্জ জরুরি ভিত্তিতে রয়েছে তা হচ্ছে–

ক. পোশাক শিল্পখাতের রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহের প্রতি সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যবস্থা রাখা।

খ. শিল্পে শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে শ্রমিকদের সঙ্গে সভ্য একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া।

তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া মেনে শিল্পে শান্তি স্থাপন।

গ. মালিকদের জন্য সরকারের তরফ থেকে জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা।

ঘ. বিদেশে গমনেচ্ছু শ্রমিকদের ওপর যে সব দেশি-বিদেশি মধ্যস্বত্বভোগীরা বর্তমানে অত্যাচার চালাচ্ছে তার নিরসন করে তাদের নিজস্ব সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সরাসরি

বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঙ. গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সফল উত্তরণ ঘটানো। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ও জঙ্গীবাদের

অবসান ঘটানো।

চ. নতুন শাসকশ্রেণীকে একবিংশ শতকের উপযোগী আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে
হবে। 'নব্য উদারবাদ' প্রত্যাখান করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ এবং উৎপাদনশীল
ধনীক শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অগ্রসর হওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে
হবে।

ছ. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সামরিক ব্যয় কোনক্রমেই বাড়তে দেয়া
চলবে না।

জ. আন্ত:সার্ক ও আন্ত:উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো বহুগুণ বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক ও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র : সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশক সমূহ

পরিশিষ্ট- ১

টেবিল- ১

সূচক	যুক্তরাষ্ট্র (২০০৬)	বাংলাদেশ
জনসংখ্যা	২৯৯	১৪৪
প্রতি বর্গ কি.মি. তে জনসংখ্যা	৩৩	১১০৯
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০০০-২০০৬ বার্ষিকগড়)	১.০	১.৯
মোট জাতীয় আয় (বিলিয়ন ডলারে)	১৩৪৪৬	৬৯.৯
মাথাপিছু আয়	৪৪৯৭০	৪৮০
জিডিপিতে সেবা খাতের অংশ	৭৭	৫২
জিডিপিতে শিল্পের অংশ	২২	২৮
জিডিপিতে কৃষির অংশ	১	২০

সূত্র : বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউডিআর, ২০০৮

টেবিল- ২

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি ১৯৭৫-২০০৫

দেশ	সূচক	১৯৭৫	১৯৮৫	১৯৯৫	২০০৫	
যুক্তরাষ্ট্র	মানব উন্নয়ন সূচক		.৮৭	.৯০	.৯৩	.৯৫
বাংলাদেশ	মানব উন্নয়ন সূচক		.৩৫	.৩৯	.৪৫	.৫৫
যুক্তরাষ্ট্র	মানব উন্নয়ন সূচকের প্রবৃদ্ধির হার	-	৩.৪৪%	৩.৩৩%	২.১৫%	
বাংলাদেশ	মানব উন্নয় সূচকের প্রবৃদ্ধির হার	-	১১.৪৩%	১৫.৩৮%	২২.২২%	

সূত্র : মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৭-০৮ ইউএনডিপি টেবিল ২২ পৃ. ২৬৯

টেবিল-৩

বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি এবং অন্যান্য সূচক সমূহ

জিডিপি'র বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি	যুক্তরাষ্ট্র	বাংলাদেশ
জিডিপির	২.৮	৫.৬
জিডিপির 'ডিফ্লেটর'	২.৪	৪
শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় (জিডিপির %)	৫.১ (১৯৯০) এবং ৫.৯ (২০০৫)	
	১.৫ (১৯৯০) এবং২.৫ (২০০৫)	
সামরিকখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যায় (জিডিপির%)	৫.৩ (১৯৯০) এবং ৪.১ (২০০৫)	১ (১৯৯০) এবং ১ (১৯৯০)
পণ্য ও সেবার চলতি হিসাব ভারসাম্য (২০০৬)		(-) ৬.৪৮ জিডিপি
		(-)২.৮% জিডিপি
ব্যাংক ঋণের প্রবাহ (২০০৬)	২৩০% জিডিপি	৫৮% জিডিপি
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৮৫৬৬৬৯ ডলার (.৮৩% জিডিপির)	
৮০২ মিলিয়ন ডলার		(১.২৯% জিডিপি)

বেকারত্ব	সংখ্যা (হাজারে)	৭০০২	২০০২
	শ্রমশক্তির শতাংশ	৪.৬	৪.৩
বৈষম্য	দরিদ্রতম ১০%এর অংশ	১.৯	৩.৭
	ধনী ১০%এর অংশ	২৯.৯	২৭.৯
	ধনী-দরিদ্র অনুপাত	১৫.৯	৭.৫

পরিশিষ্ট-২

পোশাক খাতের রফতানি আয়, মোট রফতানি আয় ও রেমিটেন্স প্রবাহ

আইটেম	মাস	২০০৭	২০০৮	মন্তব্য
নিট ও হোসিয়ারি তৈরি পোশাক রফতানি (কোটি টাকায়)	জানুয়ারি	৪৩৩১	৫১৫২	+ ১৯%
	ফেব্রুয়ারি	৪০৩১	৪৭০৪	+ ১৭%
	মার্চ	৪৪৪৬	৫২৬৮	+ ১৮%
	এপ্রিল	৪৩৮২	৪৮৩৫	+ ১০%
	মে	৪৪৪৩	৪৮৫৯	+ ৯%
	জুন	৪৬৫০	৫৩৬২	+১৫%
	জুলাই	৪৭৭	NA	NA
পোশাক খাতে মোট রফতানি আয়		৫১৮৯১(২০০৬)	৫৭০৯০ (২০০৭)	+১০%

	মাস	২০০৭	২০০৮	মন্তব্য
মোট রফতানি আয় (কোটি টাকায়)	জানুয়ারি	৬৪৮৬	৭৭৪০	+ ১৯%
	ফেব্রুয়ারি	৬০৫১	৭০৯৫	+ ১৭%
	মার্চ	৬৬১৪	৭৬৬৫	+ ১৬%
	এপ্রিল	৬৫৪১	৬৭৮৮	+ ৪%
	মে	৬৯৫৭	৭৪৪২	+ ৭%
	জুন	৭২৪২	৮২৯২	+১৪%
	জুলাই	৭২৯২	NA	NA
বার্ষিক মোট রফতানি আয়		৭৮৯১৮(২০০৬)	৮৬২৮৩ (২০০৭)	+৯.৩৩%

	মাস	২০০৭	২০০৮	মন্তব্য
রেমিটেন্স				
(কোটি টাকায়)	জানুয়ারি	৩২২৩.৫১	৪৮৭৪.২৫	+ ৫১%
	ফেব্রুয়ারি	৩৪৫৩.২১	৪৭২৬.৯৫	+ ৩৭%
	মার্চ	৩৭০৪.০৮	৫৫৪৪.৫৮	+ ৫০%
	এপ্রিল	৩৭৪৮.৫৪	৫৩৬০.৯৭	+ ৪৩%
	মে	৩৮৪৯.৫৮	৫০০৭.৩৯	+ ৩০%
	জুন	৩৫৫৯.৯৪	৫১৬৩.৫৩	+৪৫%
	জুলাই	৩৮৯২.৬৪	৫৬২২.৮৮	+ ৪৪%
বার্ষিক মোট রেমিটেন্স		৪১২৯৮.৫৪(২০০৬)	৫৪২৯৫.১৪ (২০০৭)	+৩১%

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক, মান্থলি ইকোনমিক ট্রেন্ড, আগস্ট ২০০৮ ।

প্রকট বিশ্বমন্দা: তল খুঁজে ফেরা

আতিউর রহমান

সেপ্টেম্বর ২০০৮ এর পর থেকেই বিশ্বঅর্থনীতি আশ্চর্যজনকভাবে বদলে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহায়ন খাতে যে ধ্বসটা নেমেছিলো তা রূপ নিলো বিশ্বমন্দায় আর তা ছড়িয়ে পড়লো ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল দেশে। কেউ কেউ মনে করেন ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর এটিই হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্দশা। বিগত কয়েক মাসে এই মন্দার কারণেই স্টক মার্কেট থেকে প্রায় ১ লক্ষ কোটি ডলারের সমপরিমাণ মূল্য উধাও হয়ে গেছে। শেয়ার বাজারের এই দরপতন সর্বশেষ এশিয়াতেও হানা দিয়েছে। এই বিশ্বমন্দার প্রাথমিক ধাক্কাটা আসে যুক্তরাষ্ট্রের সাবপ্রাইম মর্টগেজ মার্কেট থেকে যা ভেঙে পড়ার পর তার প্রভাব প্রথমে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব অর্থবাজারে আর তারপরই সূচিত হয় বিশ্ব অর্থনীতির এক বেদনাদায়ক অধ্যায়ের।

বাংলাদেশ আর্থিক বাজারের দিক থেকে বহির্বিশ্বের সাথে খুব একটা সম্পৃক্ত না থাকলেও বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর এদেশ অনেকখানি নির্ভরশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এদেশের তৈরি পোশাক, চিংড়ি, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানি পণ্যগুলো পুরোপুরি পশ্চিমা বিশ্বের চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। তাই আমেরিকা ও ইউরোপে কর্মসংস্থান এবং সাধারণ ভোক্তাদের আয় কমে গেলে আমাদের রপ্তানি সম্ভাবনার ওপর তার একটি প্রভাব পড়তে বাধ্য। এবারের ক্রিস্টমাসে কেনাকাটার উৎসাহে ভাটা পড়ায় জানুয়ারি থেকেই এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্বে আগের বছরের ঐ সময়ের চেয়ে প্রায় দেড় শতাংশ কমে গেছে। সে কারণেই আশঙ্কা যে আমাদের রপ্তানির ওপর বিশ্ব মন্দার প্রভাব পড়বে। তাছাড়া, পাট, সুতা, জুতা, চিংড়ি প্রভৃতি রপ্তানির ওপরও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আবার তেলের দাম ক্রমাগত কমতে থাকায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নে মন্দার সম্ভাবনা থাকায় বাংলাদেশী স্বল্প-দক্ষ শ্রমিক রপ্তানিতেও একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা হয়।

নতুন সরকারকে এই সমস্যাগুলো সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেল এবং অন্যান্য জিনিসের দাম কমতে থাকাটা অবশ্য একটি সুখবর। নিশ্চিতভাবেই এটি মূল্যস্ফীতির চাপকে কমিয়ে দেবে। কিন্তু আমদানি মূল্য কমে যাওয়ায় রাজস্ব আদায়ের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

সাবপ্রাইম মর্টগেজ সংকট

সাবপ্রাইম ঋণ হচ্ছে বন্ধকী সম্পত্তির বিপরীতে দেয়া একপ্রকার ঋণ। যাদেরকে এসব ঋণ দেয়া হয় তাদের আয়ের পরিমাণ, অগ্রিম কিস্তির আকার, ঋণের ইতিহাস, পেশাগত অবস্থা এমনি আরও নানা বিষয় ঝুঁকিপূর্ণ থাকায় তারা আদতেই ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত থাকেন না। ব্যাংকগুলো ঋণের এসব ঝুঁকি তৃতীয় পক্ষের বিনিয়োগকারীদের দ্বারা সিকিউরিটাইজেশন নামে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানান্তর করে দেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে গউঝ (Mortgage Backed Securities) এবং CDO (Collateralised Debt Obligations)। সাবপ্রাইম ঋণে প্রাথমিকভাবে চার ধরনের ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঋণের ঝুঁকি, সম্পদের মূল্যের ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি এবং বিপরীত পক্ষের ঝুঁকি।

মার্চ ২০০৭ এ যুক্তরাষ্ট্রের সাবপ্রাইম মর্টগেজের মূল্য নির্ণীত হয়েছিলো ১.৩-২ লক্ষ কোটি ডলার যেখানে সমগ্র বন্ধকী বাজারের মূল্য ধরা হয়েছিলো ১২ লক্ষ কোটি ডলার। ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ এর মধ্যে আমেরিকায় বাড়িঘরের মূল্য ১২৪ শতাংশ বেড়ে যায়। এভাবে সম্পত্তির দ্বিতীয় বন্ধকী বেড়ে যায় এবং বাড়তি তহবিল ব্যবহৃত হয় ভোক্তার খরচ হিসেবে। ফলে মানুষের ঋণ ১৯৭৪ সালের ৬৮০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০০৮ সালে ১৪ ট্রিলিয়ন ডলারে এসে ঠেকে। তবে, ৪০ লাখের মতো রেকর্ডসংখ্যক বাড়ি বিক্রির জন্য পাওয়া যায় যা বাজার দামকে যথেষ্ট পরিমাণে

নিম্নমুখী হতে চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে আরও বেশি বাড়ির মালিক ঋণ খেলাপের ঝুঁকিতে পড়ে যান। বিশ্ব আর্থিক সংকটে যেসব বিষয় অবদান রেখেছে সেগুলো হলো : ঋণ প্রদানকারী অথবা ঋণ গ্রহীতা অথবা উভয়েরই দুর্বল বিচার-বিবেচনা, ভালো সময়ে স্বল্প মূল্য এবং স্বল্প সুদের হারের কারণে ফটকাবাজি এবং অতিরিক্ত দালানকোঠা তৈরি, ঝুঁকিপূর্ণ বন্ধকী দ্রব্য এবং বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট ঋণ, দুর্বল আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সজাগ দৃষ্টির অভাব, বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর আগ্রাসী কার্যক্রম এবং সম্পত্তি ও শেয়ারের অস্পষ্ট রেটিং, ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ এবং সহজ ঋণ দেয়ার অতিরিক্ত প্রবণতা, ওয়াল স্ট্রিটের অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর লোভ, আর্থিক বাজারগুলোর চোখ এড়িয়ে যাওয়া আন্ত সীমান্ত সংযোগ, বাজার ব্যবস্থার গোঁড়া দর্শন এবং এমনই আরও অন্য সব ব্যাপার।

সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশের সরকার এই আর্থিক সংকটের প্রভাব প্রশমন করতে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশ ব্যাংক, বীমা কোম্পানি এবং মর্টগেজ হাউজসহ দানবীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যত জাতীয়করণ করে ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস করদাতাদের টাকা দিয়ে এক বিশাল উদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি সমস্যাআক্রান্ত ব্যাংকগুলো থেকে ১.৫ লক্ষ কোটি ডলারের সমপরিমাণ খেলাপী বন্ধকী এবং অন্যান্য সম্পত্তি কিনে নেয়ার একটি আইন পাশ করেছে। এটি ব্যাংকের হিসাবের খাতা থেকে খেলাপী ঋণগুলোকে মুছে দেবে যাতে তারা আবারও স্বাধীনভাবে ঋণ দেয়া শুরু করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং এশিয়াতে সব মিলিয়ে ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলারের উদ্ধার তৎপরতা নেয়া হয়েছে। ভারত তার মূল সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে নামিয়েছে (২০ অক্টোবর ২০০৮)। চীনও সুদের হার কমিয়েছে এবং মূলত অবকাঠামো ও সামাজিক কর্মসূচীর ওপর লক্ষ্য রেখে ৫৮৬ বিলিয়ন ডলারের একটি উদ্দীপক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। তাদের দেখাদেখি দক্ষিণ কোরিয়াও ১১ বিলিয়ন ডলারের অনুরূপ উদ্দীপক প্যাকেজ ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে তাদের নিজ নিজ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সরাসরি সহায়তা দেবার জোরালো পরামর্শ দিয়েছে। আইএমএফ বলেছে এজন্য আগামী বছরগুলোতে ৬৫৭ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হতে পারে। বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থার পুনঃসংস্কারে ইতোমধ্যে কয়েকটি বৈঠক হয়ে গেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বৈঠকের সূচী রয়েছে।

আর্থিক সংকটের পরিণতিতে বিশ্বব্যাপী ইউএস ডলারের বিপরীতে অনেক দেশের মুদ্রার বিনিময় হার পড়ে যায় যদিও খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই মন্দা চলছিলো। বিশ্বব্যাপী শেয়ার মার্কেটে মারাত্মক দরপতন হয়, সম্পত্তির দাম কমে যায় অনেক পশ্চিমা দেশেই। আর যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব বেড়ে যায় ভীষণভাবে। যুক্তরাষ্ট্রে সেপ্টেম্বর মাসে ৬৫,৪০০ জনের চাকরি খোয়া যায়। বর্তমানে বেকারত্বের হার ৬.৫ শতাংশে

প্রাক্কলিত হয়েছে এবং উন্নত দেশগুলোতে ভোক্তার আত্মবিশ্বাসে ধরেছে ফাটল। আইএমএফ এর ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক অক্টোবর ২০০৮ সংখ্যায় বলা হয়েছে ২০০৭ এর ৫ শতাংশের তুলনামূলক দারুণ প্রবৃদ্ধির তুলনায় ২০০৮ এর বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যাবে ৩.৯ শতাংশে আর ২০০৯ এ এই সংখ্যা গিয়ে ঠেকবে ৩ শতাংশে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভাব

উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রথম দফায় সবচেয়ে গুরুতর ধাক্কাগুলো না খেলেও বর্তমানে তারা আরও বিপদের মধ্যে পড়ে গেলো। এর কারণগুলো হলো: ক্রমাগত নিঃশেষ হতে থাকা পুঁজির প্রবাহ, শেয়ার বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ চলে যাওয়া এবং দ্রুত গতিতে উর্ধ্বমুখী সুদের হার। প্রশ্নটি এখন 'আদতেই প্রভাব পড়বে কী না' তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং 'কখন' এবং 'কীভাবে' এই মন্দা উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রভাবিত করবে সেটিই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশগুলো কী মাত্রায় প্রভাবিত হবে তা অনেকখানি নির্ভর করবে সেসব দেশের অর্থনীতির আকার ও কাঠামোর ওপর এবং দেশগুলো বহির্বিশ্বের সাথে কীভাবে ও কতটুকু সংযুক্ত তার ওপর। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর আর্থিক সংকটের পুরো প্রভাব এখনও তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। তাৎক্ষণিক উপাত্ত না পাওয়া এর একটি বড় কারণ। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ঝুঁকির মাত্রা ওঠানামা করবে, তবে সবগুলো ক্ষেত্রেই মাত্রাটি তীব্র হওয়ার সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে।

রপ্তানি চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে গেলে অর্থনীতির ওপর সাথেসাথেই বড়সড় প্রভাব পড়বে। তার কারণ, অভ্যন্তরীণ চাহিদার মাধ্যমে তার পুরোটাই পূরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসট্যান্স যদি অপ্রত্যাশিতভাবে কমে যায় তাহলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি আরও কমে যাবে। ২০০৯ সালে সকল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমে যাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। এসব দেশের প্রবৃদ্ধি মাত্র সাম্প্রতিক সময়েও যেখানে ৬.৪ শতাংশ ধরা হয়েছিলো সেখানে এখন তা মাত্র ৪.৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশ্ব ব্যাংকের অর্থনীতিবিদরা। উপরন্তু, ধনী দেশগুলোর ক্ষেত্রে আগামী বছরে ০.১ শতাংশ সংকুচিত হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক সম্পর্ককে বিবেচনায় আনলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দুর্ভোগ আরও বাড়বে। বিগত দুই বছর খাদ্য ও জ্বালানী তেলের ক্রমাগত উচ্চমূল্যের কারণে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রচেষ্টা পিছিয়ে পড়েছে। যেসব স্বল্পোন্নত দেশ রপ্তানির ওপর নির্ভর করে তাদের জন্য এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তারা কীভাবে তাদের পড়ন্ত রপ্তানি চাহিদার ধাক্কা সামলে উঠবে এবং কীভাবে তাদের বাড়তে থাকা অভ্যন্তরীণ গণ-বেকারত্ব প্রতিরোধ করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু কিছু অঞ্চলে মূল্যস্ফীতির সমস্যাটা রয়েই গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার ওপর প্রভাব

আমরা যদি বাদ বাকি বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংযুক্তি তুলনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ২০০৬ সালে জিডিপিতে বাণিজ্যের শতকরা অংশ সবচেয়ে বেশি ছিল: ভারতে (৪৮.৭৮ শতাংশ), তারপরে ছিল যথাক্রমে বাংলাদেশে (৪৪.২২ শতাংশ) ও পাকিস্তানে (৩৮.৬১ শতাংশ)। জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি পায় পাকিস্তান (৩.৩৭ শতাংশ), এর পরপরই রয়েছে ভারত (১.১৯ শতাংশ) ও বাংলাদেশ (১.১৩ শতাংশ)। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার লক্ষ্য করলে দেখা যায় ইউএস ডলারের বিপরীতে সবচেয়ে বেশি কমেছে পাকিস্তানি রূপির মান এবং তারপরে ভারতীয় রূপির। তবে বাংলাদেশী টাকার মান মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। আইএমএফ-এর উপাত্ত এবং পূর্বাভাস বলছে এই তিনটি দেশের সবগুলোতেই জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বিগত বছরগুলোর তুলনায় কমে যাবে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশেরও বেশি প্রত্যাশা করছে আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পূর্বাভাস দিচ্ছেন ৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির। পাকিস্তানে বিগত কয়েক বছরে ৭-৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু এর বেশিরভাগই হয়েছে ভোক্তা অর্থায়নের মতো খাতগুলোতে। কৃষি, শিল্প, খনিজ দ্রব্য উত্তোলন প্রভৃতির মতো প্রকৃত খাতগুলোতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে কম আর দারিদ্র্য নিরসনের মাত্রাটি ছিল যৎসামান্য। আইএমএফ-এর হিসাবমতে, ২০০৯ সালে মূল্যস্ফীতি হবে ২৩ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধি হবে মাত্র ৩.৫ শতাংশ। পাকিস্তানি রূপির অবমূল্যায়ন দেশটির বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে উল্টো আঘাত হেনেছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এত নিচে নেমে গিয়েছে যে তা দিয়ে কোনোরকমে মাত্র ৯ সপ্তাহের আমদানি সংকুলান করা সম্ভব। বিপদ থেকে বাঁচার জন্য পাকিস্তান আইএমএফ-এর সাহায্য চেয়েছে। দেশটির জন্য ৭.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলারের সাহায্য অনুমোদিত হয়েছে এবং দেশটি চীনের কাছ থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ প্রত্যাশা করছে। প্রাথমিকভাবে ২৩ মাসের একটি সাহায্য পরিকল্পনার আওতায় ৩.১ বিলিয়ন ডলার আসবে আর বাকিটা আসতে থাকবে পরে।

হংকং, সিঙ্গাপুর এবং তাইওয়ানের মতো পূর্ব এশীয় দেশগুলো যারা রপ্তানির ওপর একটু বেশি নির্ভরশীল তাদের তুলনায় ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কম ছিল। ভারতে চলমান অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কমে যেতে থাকা বিনিয়োগের কারণে প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৮ শতাংশে নেমে আসে। ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর মতে, বিশ্ব মন্দার কারণে উন্নত দেশগুলোতে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা প্রভাবিত হবে এবং চলমান অর্থবছরে ২০০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ফস্কে যেতে পারে। রিয়েলএস্টেট এবং বস্ত্রখাত ইতোমধ্যে মন্দার কবলে পড়ে গেছে। মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার কারণে পর্যটন এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু খাত স্বল্প মেয়াদে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে যদিও এই

সংকটের সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। ভারতে অর্থবছর '০৮-এর তৃতীয় প্রান্তিকে অর্থাৎ জুলাইয়ে তার আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছিলো ৩৩.৭ শতাংশ আর সেপ্টেম্বরে তা নেমে দাঁড়ায় ১২.৬ শতাংশে কারণ উন্নত দেশগুলোতে চাহিদা নাটকীয়ভাবে কমে যায়। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সেবা, ম্যানুফ্যাকচারিং ও কৃষি খাত সবগুলোতেই প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে গিয়েছে। অর্থনৈতিক মন্দার কথা মাথায় রেখে ভারতের শিল্পখাত আরও বিচক্ষণ অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করছে। মন্দার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখে ভারত যেহেতু তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা চাঙ্গা করতে চাচ্ছে তাই চলমান অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব ও বাজেট ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এবং মূল্যস্ফীতির মোকাবেলা করার জন্য সরকার কর ও শুল্ক ছাড়ের মাধ্যমে ৩১,০০০ কোটি রূপি ছেড়ে দিয়েছে। ভারতীয় মুদ্রা পড়েছে চাপের মুখে। ঐদেশে এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

বাংলাদেশ অর্থনীতির ওপর প্রভাব

এই সংকটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছু ঝুঁকি রয়েছে। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই প্রভাবটি নির্ভর করবে সংকটের প্রকৃতি, আওতা, তীব্রতা ও মেয়াদের ওপর। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বের সাথে আর্থিকভাবে ক্রমাগত সংযুক্ত হচ্ছে তবুও এদেশের আর্থিক খাত ভারতের মতো বাদবাকি বিশ্বের সাথে ততটা সম্পৃক্ত নয়। ব্যাংকিং খাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ; তবে, শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগ রয়েছে মাত্র ২.৬ শতাংশ। যেহেতু বাইরে টাকা পাঠানোর ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত, তাই বিপুল পরিমাণে মূলধন উড়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং দেশের আর্থিক খাতে সংকটের প্রভাব অনুভূত হবে কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না। হলেও তা কতোটা তীব্র হবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে সর্বশেষ বিডিআর সদর দপ্তরের সহিংসতার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর চাপ পড়েছে। ব্যবসায়ীদের আস্থার সূচক বেশ খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হয়তো এই অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। কিন্তু বিশ্ব মন্দার নেতিবাচক প্রভাব থেকে সহজেই পার পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

প্রধানত রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক সাহায্যের দিক থেকেই ঝুঁকির আশঙ্কাটা বেশি। বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণ এবং অতীত সংস্কারের কারণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক খাতের অবস্থা মোটামুটি ভালো। বহির্বিশ্বের সাথে এটি যথেষ্ট পৃথক অবস্থায় রয়েছে এবং পশ্চিমের পুঁজিবাজারের জটিল ডিরাইভেটিভগুলোর সাথে এর সংযোগ নেই বললেই চলে। বকেয়া ঋণের পরিমাণ কমছে আর পুঁজির ভিতটাও মোটামুটি স্বস্তি দায়ক। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভালো অবস্থানে রয়েছে। বেশিরভাগ রিজার্ভ রাখা হয় নগদ অর্থে আর বাকিটা রাখা হয় ইউএস ট্রেজারি বন্ড, বিভিন্ন সরকারি বন্ড, বিভিন্ন

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হিসাব রাখা প্রভৃতির মাধ্যমে। তবে কোনো বিদেশী কর্পোরেট বন্ড রাখা হয় না। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৫.৩ বিলিয়ন ডলার। হালে তা আরও বেড়েছে।

অল্প কিছু লেনদেন যেমন প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ব্যতীত মূলধনী হিসাবে কড়াকড়ি রয়ে গেছে। স্বল্প মেয়াদে মুদ্রার বিনিময় হার এবং বৈদেশিক রিজার্ভের ওঠানামার ফলে যে ঝুঁকির উদ্ভব হয় তা কমাতে সাহায্য করছে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের নীট প্রবাহ সাম্প্রতিক সময়ে মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। অন্যদিকে ব্যক্তিখাতে ঋণের লেনদেন সীমিত এবং তা রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়া নজরদারিতে। ব্যাংকিং খাতের জন্য সম্ভাব্য একটি হুমকি হলো এই দেউলিয়াত্বের মুখে বিদেশী ক্রেতাদের আমাদের রপ্তানি পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে না পারা, বিশেষত তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৭ শতাংশ যায় উন্নত দেশগুলোতে। সমগ্র রপ্তানির ৭৫ শতাংশেরও বেশি আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে যার অধিকাংশই বিক্রি হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে। সুতরাং তৈরি পোশাকের ওপর প্রভাবটা কীরকম হবে তার ওপর নির্ভর করছে দেশের সমগ্র রপ্তানির ভাগ্য। চলমান মন্দা দেখে মনে হচ্ছে রপ্তানির ওপর একটা আঘাত আসবে। কয়েকটি ব্যাপার আমাদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে যা আমরা একটু বিবেচনা করতে পারি। যেহেতু পোশাক বাজারের মূলত কম-দামী অংশেই এদেশের তৈরি পোশাকের সরবরাহটা যায় তাই চলমান সংকটের কারণে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে খুব একটা সমস্যা নাও হতে পারে। আয় কমার সাথে সাথে মানুষের চাহিদা বেশি-দামী কাপড় থেকে কম-দামী কাপড়ের দিকে ঘুরে যেতে পারে। তবে আবার মানুষ এমনটাও ভাবতে পারে যে কম-দামী কাপড় না কিনে বরং বেশি-দামী কাপড়টাই কম কিনি।

তৈরি পোশাকের প্রধান ক্রেতারা বাজারের ভগ্নদশার সুযোগ নিয়ে স্বল্পোন্নত দেশের সরবরাহকারীদের সাথে কম আকর্ষণীয় চুক্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ হচ্ছে তৈরি পোশাকের সবচেয়ে সস্তা প্রস্তুতকারক। বস্তুত একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ১০ মিলিয়ন ডলারের একটি অর্ডার পেয়েছে যা স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে চীন থেকে। ভারত, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়া থেকে স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে এমন কিছু অর্ডার নিয়েও আলোচনা চলছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮-এ রপ্তানি এর পূর্বের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মন্দা দীর্ঘায়িত হলে এ ধারা অব্যাহত থাকবে কিনা সেটি আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন।

বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানী তেলের নীট আমদানিকারক। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিশ্ব বাজারে বিভিন্ন পণ্য যেমন- চাল, গম, ভোজ্য তেল,

জ্বালানী তেল, সার প্রভৃতির মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে যা বাংলাদেশের জন্য ভালো। জুলাই-অক্টোবর ২০০৮-এ ভোক্তা পণ্যের জন্য এলসি খোলার পরিমাণ ১৯ শতাংশ কমে যায় (বাংলাদেশ ব্যাংক)। অন্যদিকে, মূলধনী দ্রব্য কেনার জন্য এলসি খোলার পরিমাণ বেড়ে যায় ৮.৫ শতাংশ যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদনক্ষমতার জন্য একটি ইতিবাচক ব্যাপার। অস্ট্রেলিয়ান ডলার, কানাডিয়ান ডলার প্রভৃতি মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্য বেড়ে গেছে যার ফলে ওইসব দেশ থেকে আমদানি আরও সস্তা হয়ে গেছে। সার্বিক মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বরের ১০.১৯ শতাংশ থেকে কমে অক্টোবরে ৭.২৬ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২.০৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৮.০৮ শতাংশ। এগুলো সবই পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট হিসাবের ভিত্তিতে। বছর শেষে গড় ও খাদ্য মূল্যস্ফীতি দুইই আরও কমেছে। এখন তা ৬ শতাংশের ধারে কাছে চলে এসেছে। স্পষ্টতই দ্রব্যমূল্য কমেছে। কমেছে খাদ্যমূল্যও।

জুলাই-অক্টোবর ২০০৮-এ রেমিট্যান্স প্রবাহ তার আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৬.৫ শতাংশ বেড়ে যায়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ রেমিট্যান্স আসে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে। চলমান মন্দার কারণে তারা এখনও ততটা দুরবস্থায় পড়েনি। তবে, তেলের দাম জুলাই ২০০৮ যেখানে প্রতি ব্যারেল ছিল ১৪৭ ডলার তা বর্তমানে খুব দ্রুত ৫০ ডলারের নিচে নেমে এসেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সেসব দেশের নতুন নতুন নির্মাণ প্রকল্প থেমে যাবে এবং এ কারণে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির চাহিদা কমে যেতে বাধ্য। হালে এ ধরনের আলামত বিদেশগামী শ্রমশক্তির বেলায় পড়তে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ আগে থেকেই কম ছিল আর এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প। বিশ্ব ঋণ বাজারের সংকোচনের ফলে বিনিয়োগের খরচ বেড়ে গেছে আর এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ কমে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ বাড়ানোর ব্যাপারটি অনেকখানি নির্ভর করে অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, সুশাসন এবং ব্যবসা বান্ধব পরিবেশের ওপর। তাছাড়া, সর্বশেষ বিডিআর সহিংসতায় বৈদেশিক বিনিয়োগ বাজারে বড় ধরনের অনিশ্চয়তার যে সৃষ্টি হয়েছে তাতো অস্বীকার করা যাবে না।

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের বেশিরভাগই (প্রায় ৮০ শতাংশ) আসে বহুপক্ষীয় উৎস থেকে। স্বল্প মেয়াদে হয়তো ঋণের প্রবাহ তেমন একটা কমবে না তবে ভবিষ্যতে ঋণ প্রবাহ বাড়ার প্রতিশ্রুতি আলোর মুখ নাও দেখতে পারে। ২০০৯ - ১০ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্য না বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ উন্নত দেশগুলো হয়তো নিজেদের ঘরের সমস্যা সমাধানেই বেশি ব্যস্ত থাকবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক চলমান অর্থবছরের জন্য ৬.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করেছে। তবে, বিশ্ব ব্যাংক বলছে প্রবৃদ্ধির এ হার ৪.৮ থেকে ৫.৪ শতাংশের মধ্যে

থাকবে। এডিবি সম্প্রতি বলেছে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৫.৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যেই ঘুরপাক খাবে। কিন্তু আমার ধারণা প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের বেশিই হবে। বাংলাদেশে এ বছর পূর্বের মতো তেমন বড়সড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়নি যার ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এ কারণে এ ধরনের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে। দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অর্ধেকেরও বেশি সংঘটিত হয় অনানুষ্ঠানিক খাতে। এর সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া বেশ মুশকিল। অনানুষ্ঠানিক খাতে এদেশের বহু মানুষ জড়িত; বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং বিশ্বব্যাপী এই আর্থিক সংকটে এ-খাত প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এসব কারণে চলমান এই সংকটের প্রভাব বাংলাদেশের ওপর কীভাবে পড়বে তার সত্যিকারের একটি চিত্র আঁকা খুবই কঠিন। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দলিত লোকজনের অবস্থা কী হবে তা বলা যাচ্ছে না। সরকারকে এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যেতে হবে। সে কারণেই কৃষিকে আরও মদদ দিয়ে যেতে হবে। সবশেষে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়া সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন মাত্রায় চলমান আর্থিক সংকটের ফলাফল সুস্পষ্টভাবে টের পাচ্ছে। বর্তমান বিচারে পাকিস্তান হয়তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারত বিভিন্ন অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে এবং প্রবৃদ্ধির শ্লথগতি ঠেকাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপক প্রকল্প গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। তা সত্ত্বেও, দুটো দেশেই জঙ্গি হামলার কারণে ব্যবসায়ী আস্থায় চিড় ধরেছে। এসবের প্রভাব প্রবৃদ্ধির ওপর নিশ্চয় পড়বে।

চলমান সংকটে বাংলাদেশ কী মাত্রায় প্রভাবিত হবে তা এখনও অস্পষ্ট। বর্তমান পরিস্থিতিতে রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের মতো কিছু কিছু নির্দেশকের চেহারা উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু তাই বলে সরকারকে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। দীর্ঘ ও প্রকট একটি মন্দা মনে হচ্ছে আসন্নই; তাহলে বাংলাদেশের ওপর অপরিহার্যভাবেই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল পর্যায়ে বাংলাদেশকে এই সংকট মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সংকটের গভীরতা বুঝে সময়ের প্রয়োজনে যে ধরনের নীতিমালাই দরকার হোক না কেন তা গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য বিশেষজ্ঞ দলের নিয়মিত নজরদারির বাইরেও উপযুক্ত একটি টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন যাতে কোনোভাবেই কোনো রকম নিষ্ক্রিয়তা গজিয়ে উঠতে না পারে।

অনুবাদ মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি

[ড. আতিউর রহমান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন সিনিয়র ফেলো বি. আই. ডি. এস।]

দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় চাপ: মধ্যবিত্তের ভূত-ভবিষ্যৎ

ফরীদুল আলম

মধ্যবিত্ত বলতে আমরা যাদের বুঝি তারা প্রধানত নিম্ন আয়ের শিক্ষিত চাকরিজীবী শ্রেণী। এদের মধ্যে উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশার মানুষও অন্তর্ভুক্ত। এক শতাব্দী আগে, 'মধ্যবিত্ত' নামটা যখন ব্যবহৃত হওয়া আরম্ভ হয়নি তখনও এই বিরাট শ্রেণীর সমস্যা যা ছিল এখনও প্রায়
তা-ই আছে। সমস্যাগুলোর ভিতরে প্রবেশ করতে হলে অবশ্য 'মধ্যবিত্ত'র একটা সংজ্ঞা প্রয়োজন। 'বিত্ত' কথাটা ব্যবহৃত হওয়াতে এই সংজ্ঞার জন্য প্রয়োজন উচ্চ-বিত্তের একটা নিম্নসীমা আর নিম্ন-বিত্তের একটা উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা। এই দুই সীমার মাঝখানে যারা রয়েছে তারাই এই মানদণ্ডে 'মধ্যবিত্ত'। কিন্তু আমরা মধ্যবিত্ত বলতে যাদের বুঝি তাদের এই বিশেষ আর্থিক স্তর ছাড়াও অন্য আরও বেশকিছু বিশেষত্ব আছে।

ইংরেজি MIDDLE CLASS আর বাংলা 'মধ্যবিত্ত' কখনই এক অর্থ জ্ঞাপন করে না। ইংরেজ সমাজে MIDDLE CLASS একটা সামাজিক বিভাজন। অভিজাত শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণী এই দু'য়ের মাঝখানে যারা থাকে তারাই MIDDLE CLASS হিসাবে পরিগণিত। উচ্চ-বংশজাত কোনো ব্যক্তি দরিদ্র হলেও সে এই MIDDLE CLASS-এর আওতায় পড়ে না। অন্যদিকে দোকান পরিচালনা, ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে যারা ধনবান হয়েছে তারা অভিজাত শ্রেণীর আওতাভুক্ত হতে পারে না– মধ্যবর্তী শ্রেণীতেই তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এছাড়াও পশ্চিমা সমাজে GENTLEMAN নামে একটা স্তরভেদ আছে। সামাজিক স্তরে GENTLEMAN D"P-বংশজাত হিসেবে স্বীকৃত এবং সাধারণত এরা ভূ-সম্পত্তির মালিক।

ভারতবর্ষে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিশেষ করে তৎকালীন বঙ্গীয় অঞ্চলে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান শুরু হয়। শিক্ষায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ও বিজ্ঞানচর্চায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতে থাকেন। এদেশের নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে একটানা দেড়শত বছর ধরে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের ভূমিকা পালন করে এসেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক লগ্নে উদ্ভূত হন একদল অসাধারণ কীর্তিমান ব্যক্তি। যাদের আদর্শনিষ্ঠা ও মানবপ্রেম, সততা, নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতায় ও মূল্যবোধে

বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সঞ্জীবিত হন নতুন শক্তিতে। বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মাঝখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের সম্মানের আসনটি বজায় রাখতে সক্ষম থেকেছেন এই কিছুকাল আগে পর্যন্তও। তৎকালীন ভারতবর্ষে পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয় প্রধানত ইংরেজ শাসনের ফলাফল হিসেবে। ভারতীয় উপমহাদেশে বিদেশী শাসন পাকাপোক্ত করার প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হয় এবং একই কারণে প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্র দ্রুত প্রসারিত হয়। ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থে ভারতবর্ষীয় সামাজিক কাঠামোর আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন হয় নিত্য-নতুন উদ্যোগের। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্যভাবে উদ্ভব ঘটে পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পরে ইংরেজ শাসক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আনুগত্যের এক সুদূর বনিয়াদ নির্মাণে তৎপর হয়। পরবর্তী পর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাথমিক আনুকূল্যে ভারতবর্ষে ধনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংখ্যার দিক দিয়ে স্বভাবতই বাড়তে থাকে। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জন করেছিলেন– সমসাময়িক সমাজজীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশিষ্ট স্থান অস্বীকার করা কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই স্বীকৃতি নানা কারণে আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের রূপটি ছিল বন্ধুত্ব ও বিরোধিতার এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। সে সময় উচ্চবিত্তের দাক্ষিণ্য ও অনুকল্যের ওপরই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভরশীল ছিল– অন্যদিকে, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বৈষয়িক স্বার্থ ও প্রভূত্বের বিশেষ সহায়ক উদাহরণ হিসেবে কাজ করত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেশাগত দক্ষতা ও সামাজিক সমর্থন। কর্মসূত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সবসময়ই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেত বলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থসর্বস্বতা ও সম্পদ আহরণের আগ্রাসী পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব ছিল। মূলত এ অবস্থান থেকেই জন্ম নিয়েছে উচ্চবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে মধ্যবিত্তের বিরাগ ও পরোক্ষ ঘৃণা। উচ্চবিত্ত শ্রেণী ও নিম্নবিত্ত তথা প্রান্তিক শ্রেণীর মাঝামাঝিতে অবস্থানের কারণে এই দুই শ্রেণীর আচরণ ও অভ্যাসের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল মধ্যবিত্তের নিজস্ব জীবনচর্যা। আবার, নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দূরত্ব খুক বেশি ছিল না বলে নিম্নবিত্তের বিড়ম্বনা ও দুঃখ-দারিদ্র অনুভব করার সুযোগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক বেশি ছিল। এ কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতায় নিম্নবিত্তদের সম্পর্কে সহানুভূতি ও আর্তি স্থান পেয়ে এসেছে এতকাল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে তার উপরের অবস্থানের শ্রেণী এবং নিম্ন অবস্থানের শ্রেণী এই দু'টিরই মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্রে, আচরণে ও মানসিকতায় এক দ্বৈত সত্তা মূর্ত হয়ে ওঠে। একদিকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেখা যায় প্রতিবাদী, সংগ্রামী ও নতুন ধারার স্রষ্টার ভূমিকায়; অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তায় ও কাজে প্রকট হয়ে ওঠে রক্ষণশীলতা ও আপোষকামিতা এবং পরিবর্তনহীনতা কিংবা

স্থিতাবস্থার প্রতি যুক্তিহীন, বিশ্বস্ত আনুগত্য, অবশ্য এই দ্বৈত ভূমিকা তথা চরিত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বঙ্গীয় অঞ্চলের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গৌরবময় ভূমিকা রেখেছে। এ অঞ্চলের শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি তথা রাজনীতি ও সমাজনীতি চর্চায় যে বৌদ্ধিক অগ্রগতির নজির রয়েছে তার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির। মানবতাবাদ ও গণতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে যে সব সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন জনজীবনকে আলোড়িত করেছে সেগুলোতেও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করা সম্ভব হয়েছিল। আত্মসচেতনতা এবং কতকাংশে আত্মগর্বিত শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সজাগ ছিল বলেই তাদের পক্ষে এই ধরনের ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাচীন তথা সনাতনী ঐতিহ্য ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে নিজেদের মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শ তৈরি করেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী খুবই যত্নের সাথে। সামগ্রিক জীবনচর্যায় এই আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার মোটামুটিভাবে বজায় রাখতে পেরেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে আজকের বাংলাদেশী মধ্যবিত্তদের অবস্থা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আমাদের আধুনিক সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও তাদের চিন্তায় ও কর্মে, আচরণে ও জীবনধারণ পদ্ধতিতে এক রকম নৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্ন আজ সুস্পষ্ট। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বর্তমান প্রবন্ধে শুধুমাত্র বাংলাদেশী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথাই আলোচনা করা হচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মধ্যবিত্ত এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমানে জীবনের মহত্তর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদাসীন। সংকীর্ণ আত্মসর্বস্বতায় নিমজ্জিত, বিপন্ন তাদের মনুষ্যত্ব। এরা নিরীহ ও নির্বিরোধী, ভীরু ও দুর্বল। আহার-নিদ্রা-মৈথুন ও উপরের শ্রেণীতে উঠে যাবার নিরন্তর অপপ্রয়াসে আবদ্ধ তাদের সমস্ত সৃজনীশক্তি ও কল্পানার ভূবন। চিন্তার জগতে পূর্বসূরীদের মতো আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখন আর নতুন পথের দিশারী হওয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা ধারণ করে না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো, দুঃশাসন ও দুরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো শক্তি ও সাহস আজ তাদের নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো ধরনের অন্যায় মুখ বুঁজে হজম করে নেয় আমাদের বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বার্থের সংঘাত তীব্র হওয়ার ফলে এরা প্রায়শই পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে নিজেদের শক্তির অকারণ অপচয় ঘটায়। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই হানাহানির মধ্য দিয়েই প্রকট হয়ে ওঠে তাদের নীচতা, স্বার্থপরতা এবং কখনও কখনও অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা।

আমাদের মধ্যবিত্তের সামাজিক ভূমিকা এখন নানা দোষে কলঙ্কিত। সামাজিক দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যচেতনা এই শ্রেণীটিকে এখন আর উদ্বুদ্ধ করে না। যে কোনো

উপায়ে নিজের সামাজিক অবস্থানকে আরও উপরের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়াই এদের মূল লক্ষ্য। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নিতান্ত গুরুত্বহীন এবং আত্মরক্ষার জন্য যে কোনো ধরনের চাতুরীর আশ্রয় নিতে এরা এখন দ্বিধা বোধ করে না। এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারায় এ বিষয়ের হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে। চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত কর্মক্ষেত্রে নিজের বরাদ্দ কাজে ফাঁকি দেয়। ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তের কথা যত কম উল্লেখ করা যায় ততোই ভালো। সততা ও নিষ্ঠা এদের কাছে নিতান্তই যেন নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। লাভের অংক বড়ানোর জন্য সকল ধরনের অসদুপায় অবলম্বনে এরা অত্যন্ত পটু। লোকঠকানো ও চালাকী ব্যবহারে এদের বিন্দুমাত্র অনীহা নেই। নিজেদের সুবিধা আদায়ের জন্য এরা আশ্রয় নেয় রাজনীতির। যে কোনো দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, শাসক দলের ছত্রছায়ায় সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তরা দলে দলে জড়ো হয়। তাদের আদর্শহীনতায় সামগ্রিকভাবে ব্যাহত হয় রাজনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা ও বলিষ্ঠতা। সমাজের সার্বিক অধঃপতনের জন্য তাদের অবিরাম হাহাকার লক্ষ্যণীয়ভাবে দর্শনীয়। এ ব্যাপারে তারা অন্যের ওপর দোষারোপ করে, কিন্তু নিজেদের দোষত্রুটি স্খলনের কোনো চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। সামাজিক আদর্শ বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। নিজেদের দুর্নীতি ও দুর্বলতার চারপাশে ভণ্ডামীর উঁচু দেওয়াল তৈরি করে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টার এরা রত।

দুই

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রকোপ– এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে মধ্যবিত্তের চরিত্র বিশ্লেষণের অবতারণা করা হলো। বস্তুত মধ্যবিত্তের বর্তমান শ্রেণীটির অবয়ব বিষয়ে কয়েকটি কথা না-বলে নিলে দ্রব্যমূল্যের চাপে দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর ভোগান্তির বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিত্তের মাপকাঠিতে এখন আর মধ্যবিত্তকে মধ্য বিত্তের শ্রেণীতে ফেলা যায় না– তার শ্রেণীচরিত্রই এক্ষেত্রে তার শ্রেণীবিন্যাসের প্রধান অন্তরায়। বিত্তের মানদন্ডে আপনি কাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ফেলবেন? এদেশে ৫৫ টাকা প্যাকেট দামের গোল্ডলীফ সিগারেট, ৮৫ টাকা প্যাকেট দামের বেনসন সিগারেটের প্রতিদিনের বিক্রির পরিসংখ্যান প্রমাণ করে এ দেশে বিত্তের বিচারে মধ্যবিত্তের সংখ্যা কত নগণ্য। রাজধানীসহ সবগুলো বিভাগীয় শহরে অত্যন্ত উচ্চ বেতনের কিন্ডারগার্টেন আর ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে নিজেদের সন্তানদের ভর্তি করানোর জন্য যে চাপ আর ইদুঁর-দৌড় দেখা যায় তাতে দেশে বিত্তের বিচারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব আদৌ আছে কি নেই সেই প্রশ্নই বরং মনে জাগে। ঢাকার সমস্ত ফাস্টফুডের দোকানে গেলে দেখা যায় সকল বয়সের মানুষ প্রচণ্ড ভীড় করে অত্যন্ত বেশি দামের খাবার গ্রহণ করে চলছে– এরা সবাই কি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর? ২০০৯ সালের মার্চ মাসের মূল্য অনুযায়ী ঢাকা শহরের ফ্লাটের বুকিং দিয়ে এসে পরম আত্মপ্রসাদ

অনুভব করে, তারা সকলেই কি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর? বাস্তবে বর্তমানে বাংলাদেশে বিত্তের মানদণ্ডে মধ্যবিত্তের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র।

বর্তমানের বাংলাদেশে যে শ্রেণীটি নিজেদের মধ্যবিত্ত হিসেবে দাবি করেন ও নিজেদের বিত্তের বিচারে মধ্যবিত্তের কাতারে উপস্থাপন করেন তাদের প্রতিটি পরিবারের [ব্যতিক্রম বাদে] কেউ-না-কেউ পশ্চিমের দেশগুলোতে বসবাস করেন। কেউ কেউ চাকরিসূত্রে সে সকল পশ্চিমা দেশগুলোতে অবস্থান করলেও বেশিরভাগই স্বেচ্ছায় উন্নত দেশে বসবাসের আকাঙ্ক্ষায় দয়া করে বাংলাদেশ থেকে সেসব দেশে 'হিজরত' করেছেন। সিলেট অঞ্চলের ইংল্যান্ড প্রবাসী জনগোষ্ঠী এবং সাম্প্রতিককালের আমেরিকান ডিভি ভিসাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে বাদ দিয়েই এ-তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথচ আমাদের প্রতিবেশি দেশের বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এ-প্রবণতা একেবারেই দেখা যায় না। মানসিকতায় আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দাবিদার ব্যক্তিরা যে নমুনা প্রদর্শন করেন, তা যে ঠিক কোন শ্রেণীর মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করে তা বিশ্লেষণে ও তাৎপর্য উদ্ধারে সকল সমাজতাত্ত্বিকই হার মানবেন। অত্যন্ত গতানুগতিক একটি নুমনা দেয়া যাক: রাত ন'টা, রাস্তায় সাধারণভাবে লোক চলাচল কমে আসছে, কিছু পথচারী বাড়ির পথে– হঠাৎ বৃষ্টি নামায় পাথচারীরা যে যার মতো ছাদের নিচে আশ্রয় নিলেন। মোটামুটিভাবে ১২/১৪ জন একসাথে কোনো বন্ধ মার্কেটের রোয়াকে উঠে কোনামতে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। বিত্তের বিচারে এরা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত না হলে এরা গাড়িতে চলতেন, নিদেনপক্ষে ট্যাক্সিক্যাবে বা স্কুটারে– পায়ে হেঁটে এদের পথ চলার প্রয়োজন হত না। অতএব এরা শ্রেণীসূত্রে সবাই একে অপরের সহমর্মী হবেন বলে আশা করাটা নিতান্ত অন্যায় হবে না। বর্ণিত পরিস্থিতির সময়কাল যদি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের হত, তাহলে দেখা যেত, প্রত্যেকেই একে অপরের গন্তব্য, পেশা, জীবনযাপনের হালচাল নিয়ে হালকা কথা চালাচালিতে বৃষ্টির সময়টুকু পার করে দিয়েছেন, বৃষ্টি থামলেই আবার যে যার গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা ছিল, বিশ্বাসের বোধ ছিল, একজনের দুঃখে অন্যজন সমব্যথী হতেন। কিন্তু এখনকার দিনে আলোচ্য পরিস্থিতিতে দেখা যায়, উপস্থিতদের মধ্যে সবাই নিজেদের ঠোঁট শক্ত কের চেপে রেখেছেন, আড়চোখে একে অন্যকে দেখে নিচ্ছেন, পোশাকের বিচারে নিজে অন্যদের তুলনায় কতটা বেশি অগ্রসর। এ এক আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ– দোখা যায়, সকলেই নিজেদের মোবাইল ফোনে কল এসেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার ছলে ফোনগুলো হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছেন– প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের মোবাইল ফোনটি অন্যদেরটার তুলনায় কতটা দামী সেটা অন্যান্যদের বুঝিয়ে দেয়া। সীমাহীন আত্মম্ভরিতা ও হীনমন্যতার কারণে ছোট একটু জায়গায় এতগুলো লোক কিছুক্ষণের জন্য বাধ্য হয়ে একত্রিত হলেও কেউ কারও সাথে নিতান্ত কথা বলতে কুণ্ঠিত। পাছে কথা বললে অন্যের তুলনায় নিজেকে খেলো প্রতিপন্ন করা হবে–

এই ভয়ে। কথোপকথনের ফাঁকে হয়তো নিজের ফুটো বের হয়ে আসতে পারে নিজের আজান্তেহী– এই ভয়ও থাকে তাদের মনে। এরই মধ্যে দেখা যাবে, কোনো একজন ৮৫ টাকা কিংবা ৫৫ টাকা দামের সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধুম্রশলাকায় অগ্নিসংযোগ করছেন– উদ্দেশ্য থাকে একটাই, নিজের দামী ব্রান্ড অন্যদেরকে প্রদর্শন করা। তবে অত্যন্ত হাস্যকর এবং অদ্ভুত ব্যাপারটি হচ্ছে– উপস্থিত সকলেই কেউ কারও চেয়ে কম যান না– তারা সবাই পর্যায়ক্রমে একে অপরের অনুকরণ করে যান মাত্র। এক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় যে-ব্যাপারটি ঘটে থাকে সেটি হচ্ছে, বিত্তের বিচারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দাবিদাররা কেউ কেউ এখনও পর্যন্ত পকেটে সিগারেটের আস্ত প্যাকেট রাখার ব্যাপারটি অত্মস্থ করে নেননি– ধূমপায়ী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পকেটে বেশি করে সিগারেট রাখেন না– একটি কিংবা দুটি করে সিগারেট কিনে কিংবা দূরের কোনো স্থানে আশ্রয় নেয়া হতদরিদ্র সিগারেটের ফেরিওয়ালাকে বাধ্য করেন বৃষ্টিতে ভিজে হলেও নিজের কাছে ডেকে নিয়ে একটি তিন টাকা কিংবা পাঁচ টাকা দামের সিগারেট বিক্রি করার জন্য।

এই-ই হচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দাবিদার মাননীয় ব্যক্তিবর্গের মানসিকতা। যদিও উদাহরণটি কিছুটা তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে দিয়েই দিতে হলো, কিন্তু এরই মধ্যে মধ্যবিত্তের প্রকৃত মানসিকতা ধরাপড়ে।

তিন

দ্রব্যমূল্যের বর্তমান অসহনীয় অবস্থায় মধ্যবিত্তের ভোগান্তি কী মাত্রার? এটা যাচাই করতে গেলে আমাদের একটু পেছন থেকে শুরু করতে হবে। ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে মধ্যবিত্ত বলতে শুধু আয়ের দিকটা বোঝাতো না, আরও অনেক কিছুই বোঝাতো। তখনকার দিনে 'ভদ্রলোক' মাত্রই মধ্যবিত্ত ছিলেন না, কিন্তু তখনকার দিনের মধ্যবিত্তেরা সবাই ছিলেন 'ভদ্রলোক'। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন চাকরিজীবী– কাজ করতেন সরকারি আর বেসরকারি মার্চেন্ট অফিসে, স্কুল-কলেজে, সংবাদপত্রে, প্রকাশনা সংস্থায়, আর প্রশাসন-পুলিশ-বিচার বিভাগের নিচের স্তরে। একজন তিনশত টাকার বেতনের চাকুরের বাড়িভাড়া দিতে হত ষাট থেকে আশি টাকা। তখন হাজার হাজার ইমারত-ফ্ল্যাট-এপার্টমেন্ট তৈরি হয়নি, কম ভাড়ার বাড়ি বলতে বোঝাতো একটা বড় বাড়ির অংশবিশেষ। আসবাবপত্র ছিল যথাসম্ভব কম। দু'তিনটি ছেলেমেয়ের স্কুলে পড়াবার খরচ ছিল কিন্তু স্কুলের আভিজাত্য নিয়ে ভাবনা ছিল না। প্রতি ছাত্রের জন্য মাসে সর্বোচ্চ দশ টাকা বেতন দিলেই হত। বাড়িতে বৃদ্ধা বাবা-মা, ছোট ভাই-বোন থাকত অনেকেরই। খাবার খরচ ছিল একবারেই কম– একজনের জন্য খাবার খরচ মাসে মোটামুটি ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকায় হয়ে যেত। লুঙির দাম আড়াই-তিন টাকা, শাড়ি পাঁচ-ছয় টাকা। আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনদের বাড়িতে বিভিন্ন উপলক্ষে যেতে হত, তাতে একবেলার আহার-খরচ বেঁচে যেত কিন্তু কিছু-না-কিছু উপহার নিয়ে

যেতেই হত– অবশ্য তখন উপহারের দামও ছিল বেশ কম। বোনাস জাতীয় কিছু তখন না-থাকলেও উৎসব-পার্বনের সময় মধ্যবিত্ত কিছু বাড়তি ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। আর দূরদর্শীরা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রস্তুতি নিতেন মেয়ের বিয়ের জন্য। ব্যাংক একাউন্ট অনেক কম ব্যক্তিরই থাকত। স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা, গৃহশিক্ষকেরা কাজ থেকে কিছু উপার্জন করতেন। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তাদের জীবনযাত্রা ১৯৩০–৩২ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা-র আঘাত কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। বড় আঘাত এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, ১৯৪৩ সালে এল মন্বন্তর। সরকারি হিসেবে যে ১৫ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু হয়েছিল, তাদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ছিল খুবই কম, কিন্তু মধ্যবিত্ত সেবারে বুঝেছিল মূল্যবৃদ্ধির বোঝা ও চাপ কতদূর যেতে পারে। এর ফল হিসেবে দেখা দিল এক ধরনের নির্মম সামাজিক ঔদাসীন্যের সৃষ্টি, চোখের সামনে মানুষকে না-খেয়ে মরতে দেখেও কোনো প্রতিক্রিয়া বোধ না করার বিরল ক্ষমতা অর্জন করল মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ সময়। ১৯৪৬ সালে এল দেশবিভাগের অনুষঙ্গ হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা– মানুষের হাতে মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলে গৃহীত হতে শুর করল।

আরও বড় পরিবর্তন হল সামাজিক সংস্থান ও ধনবন্টনের পরিবর্তনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যয় ও অপব্যয়ের ফলে নতুন আয়ের পথ খুলে গেল মধ্যবিত্তের জন্য– বিভিন্ন সূত্রে। চাল থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু জিনিসের ক্ষেত্রে 'কালোবাজার'-এর কথা মানুষ শুনতে পেল– উচ্চমূল্যের ভুক্তভোগী হল মধ্যবিত্ত, অধিকাংশ মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মান অনেক নিচে নেমে এল ।

তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল একেবারে মূলগত; নতুন ধনী সম্প্রদায় গড়ে উঠল, গড়ে উঠল নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। প্রায় একশত বছর ধরে সনাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে চরিত্রগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছিল সেই বৈশিষ্ট্য এই নতুন গজিয়ে-ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দেখা গেল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে যে ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল তার সাথে একমাত্র বর্তমানকালের দুর্নীতির ব্যপ্তিগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুর্নীতি সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে যাওয়ায় টাকার জোরই সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে পরিগণিত হল। মধ্যবিত্ত তার চরিত্র হারাল; অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, অভদ্র কিছু লোক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করার দাবিদার হয়ে গেল। যুদ্ধের এই অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে অন্ন-সংগ্রাম দেখা দিল। তার সঙ্গে এল দুষ্কৃতি এবং সমাজশত্রুদের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ। হতবাক হয়ে গোটা জাতিকে দেখতে হল সামাজিক জীবন ও মনের ধ্বংসকাণ্ড। কালের চাকা ঘুরে গেল– সেই ঘূর্ণ্যমান চক্রের গতিতে নীচস্তরের ব্যক্তিরা, নীচ মনোবৃত্তির কিছু মানুষ উঠে এল উপরে এবং ন্যায়নিষ্ঠ সাধু ভদ্রসন্তান চৌর্যবৃত্তির মধ্যে গৌরব খুঁজে পেল। অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়– এদের অভাব যত বেড়ে উঠল, ঠিক সেই পরিমাণই কাগজের টাকা উড়ে বেড়াতে লাগল এদেশের পথে-ঘাটে। সমস্ত দেশে দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা এবং বীভৎস নোংরামি ছড়িয়ে পড়ল

দিনের পর দিন। সে সময়কার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মিক, মানসিক এবং আর্থিক সংকটের চিত্র বর্ণিত রয়েছে ঔপন্যাসিক শহীদুল্লাহ কায়সার-এর 'সংশপ্তক' ঔপন্যাসে এবং হাসান আজিজুল হকের বেশ কিছু উজ্জ্বল ছোট গল্পে।

সেই যে শুরু– তারপর পরিবর্তন এসেছে অব্যাহত গতিতে। ১৯৪৭ সালে অজস্র মৃত্যুকে পার হয়ে এবং অজস্রতর মৃত্যুর কারণ হয়ে উপমাহদেশ বিভক্ত হল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, রক্তারক্তি, দুর্নীতি, কালোবাজারী সব মিলে যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তার অপনয়ন হল না বাংলার এই অংশে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১– এই পঁচিশ বছরের দীর্ঘপথের আনুপূর্বিক ইতিহাস তুলে ধরা বর্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাবে সম্ভব নয়। তবে ১৯২০-৩০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অনেক পার্থক্য এবং সে পার্থক্যের সূত্রপাত ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর অস্থিরতার মধ্যেও। স্বাধীনতা অর্জনের পরের প্রসঙ্গে আসা যাক। কালো টাকার আয়ে সমাজের আয়স্তরে বিভাজনের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু পরিবর্তনটা সহজেই দৃশ্যমান। কালো আয় থেকে নতুন বাড়ি, গাড়ি, মার্কেট তৈরি হচ্ছে আর কালো আয়ের দাপটের মুখোমুখি যারা সনাতন বিচারে মধ্যবিত্ত তারা পিছু হটে যাচ্ছে। অবশ্য তাদেরও আয় বেড়েছে; কিন্তু ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তারচেয়ে অনেক বেশিগুণে। বেশিদূর না গিয়ে যদি ১৯৬০ সালের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত নয় এমন শহরবাসীর ভোগ্য দ্রব্যের দাম বেড়েছে প্রায় তিরিশ গুণ– নিত্য ব্যবহার্য সব জিনিসের ক্ষেত্রেই মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ আকাশ ছোঁয়া। বিত্তের বিচারে যারা মধ্যবিত্ত,– নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদেরকেই ব্যয়-সংকোচ করতে হচ্ছে, অন্যদিকে নানা কারণে তাদের প্রয়োজনের বহর বেড়েছে। নতুন ধরনের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এর দুটো পরস্পর-সংশ্লিষ্ট কারণ আছে। প্রথমত, সর্বত্র একটা ভোগ প্রবণতার বৃদ্ধি, যার নাম CONSUMERISM–এটা হয়েছে উচ্চতর শ্রেণীর অনুকরণে। এটা একধরনের বিত্ত ও সামাজিক মর্যাদাহীনতার প্রতি অবজ্ঞার মানসিকতা থেকে হয়ে থাকে– ইংরেজিতে যাকে বলে SNOBBEYR। নানা দিকে ব্যয় সংক্ষেপ করেও টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার কিনতে হয়, কিনতে হয় রেফ্রিজারেটর, ভিসিডি প্লেয়ার, ডিভিডি প্লেয়ার, মোবাইল ফোন, সোফাসেট, মাইক্রোওভেন আর ওয়াশিং মেশিন। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের তুলনায় এখনকার মধ্যবিত্ত থাকে মোটামুটি সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে। জামাকাপড়ের জন্য খরচ করে অনেক বেশি– যেটা শুধু মূল্যবৃদ্ধির জন্য নয়, রুচি ও ফ্যাশনও বদলে গেছে। শাড়ি আজকাল প্রায় অচল হয়ে আসছে– উত্তর-ভারতীয় পোশাক সালওয়ার-কামিজ কিংবা ফতুয়া-জিন্‌স ক্রমেই শাড়ির স্থান দখর করে নিচ্ছে। আজকালকার জীবনযাত্রার ব্যস্ততায় পোশাকের এহেন পরিবর্তন প্রয়োজন– এ যুক্তির মধ্যে সার আছে, তবে ব্যয়ের প্রথম ধাক্কাটা যাকে সামলাতে হয়– তাঁর নিজের রক্তের চাপ যাতে না বাড়ে, সে ব্যবস্থাটা তিনি অন্যের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে সহজেই সামলে নেন হয়ত।

নতুন জিনিসের জন্য চাহিদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে বিজ্ঞাপনের জৌলুস। পত্র-পত্রিকায় বড় বড় রঙিন ছবিতে যে সব জিনিসের গুণগান করা হয়– সে সবই ধনীজন ব্যবহার্য, কিন্তু বেশি করে আকর্ষণ সৃষ্টি করে মধ্যবিত্তকে ঘরে। টেলিভিশনের নয়ন-মোহন এবং শ্রবণমধুর বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয় মধ্যবিত্তের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে। কোনো বিশেষ পানীয় না খেলে ছেলে-মেয়ে পরীক্ষায় ভালো করবে না, ডি-জুইস ঘরানায় স্থান করে নিতে পারবে না, ক্লান্ত স্বামী উন্নতির পথে এগোতে পারবে না– এহেন বাণী যদি দিনের পর দিন একেবারে ঘরের মধ্যে এসে যায় এবং বারবার উচ্চারিত হয়, তাহলে লোভ-সংরক্ষণ কঠিন করতে হয়। সেটা সবময়ই আইনসঙ্গত উপায়ে না-ও হতে পারে। দুর্নীতির প্রসার হয় নানা কারণে– কিন্তু মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে নতুন ধরনের ভোগপ্রবণতা শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও দুর্নীতির পথে টেনে নিয়ে যায়। মধ্যবিত্তের ব্যয়বৃদ্ধির আর একটা ক্ষেত্র ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া। সবাই চায় নামী এবং দামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের পড়াতে। বহু টাকা ব্যয় করে ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলে তাদের ঢোকানো হয়। চল্লিশ বছর আগে ভাবাও যেত না যে, এক হাজার টাকা বেতন পান এমন কোনো মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষক রাখছেন। এখন গৃহশিক্ষক ঘরে ঘরে এবং বিষয়ে বিষয়ে– এবং তার জন্য অনেক মধ্যবিত্তের বাজেট মাসে এখন দশ থেকে পনের হাজার টাকা। খুবই আশ্চর্যের কথা যে, মধ্যবিত্ত ঘরে আজকাল মায়েরা সবাই সুশিক্ষিত, অথচ তাদের স্কুলপড়ুয়া সন্তানদের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হয় গৃহশিক্ষক নিয়োগ করতে।

ছেলেমেয়ে বড় হলে সমস্যা দাঁড়ায় ব্যাপক– প্রচণ্ড চেষ্টা চলে হালে গজিয়ে-ওঠা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি করবার। অভিভাবককে এই পর্যায়ে বহু টাকা বাড়তি খরচ করতে হয় এই আশায় যে, ছেলেমেয়ের জন্য এবং পরোক্ষভাবে তাঁদের জন্যও উজ্জ্বল ও নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে। সব ক্ষেত্রে এই আশা ফলবতী হয় না। এদের মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যা পাশ করে বেরোবার পরে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কাজ পায় না। ফলে অস্থির, চঞ্চল হয়ে ওঠে এরা– সমাজের প্রতি এবং পিতামাতার প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠে। কেউ কেউ সম্পূর্ণ হাতাশার ফলে সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। গৃহশিক্ষকের কাজ করে অনেকে কিছুটা অর্থ সংস্থান করে, কিন্তু সেখানেও রয়েছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এদের জীবনে মালিন্য অসে, সংকট আসে– আর এদের অভিভাবকদের নানারকম লৌকিক দায় পালন করতে হয়। বর্তমানকালে এই সকল লৌকিক দায়ের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে– যার অন্যতম কারণ যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া। দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব আজকাল ঘাড়ে খুব একটা চাপে না– এলেও সেই দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। কিন্তু সামাজিক দায় এখন অনেক বেড়েছে– একটা বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেলে পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে মর্যাদাপূর্ণ উপহার বাবদ ঘাড়ে চলে নূন্যতম এক হাজার টাকার ধাক্কা। এর উপরে আছে ছেলেমেয়েদের জন্মদিন এবং তাদের বন্ধুদের জন্মদিন। বহু টাকা খরচ

করে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে যেসব ছেলেমেয়েদের পড়ানো হচ্ছে, তারা বাঙালিয়ানাতে গর্বিত নয়। তাদের উৎসব পাশ্চাত্য-রীতির এবং স্বভাবতই ব্যয়বহুল। মাত্র কায়েকদিন আগে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রদর্শিত হয়েছে এসব ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের তেলেসমাতি– বেশকিছু ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে LIVE INTERVIEW-তে বাংলায় তাদের নাম লিখতে বলা হলে অধিকাংশই মাতুভাষায় নিজের নামটি শুদ্ধ বানানে লিখতে সক্ষম হয়নি। এরপর মধ্যবিত্তের আর একটি বড় দায় হচ্ছে কন্যাদায়– একটি কন্যার বিয়ে দিতে গেলে আজকালকার বাজারে বিত্তের বিচারে মধ্যবিত্তকে সর্বনিম্ন পাঁচ লাখ টাকা খরচ করতে হয়।

মধ্যবিত্তের বার্ধক্য বর্তমানে প্রবলভাবে শোচনীয়। ব্যতিক্রম তো সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে, কিন্তু এমন অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন যারা তাদের শেষ সম্বল দিয়ে কোনোমতে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই করে নিয়েছেন, পেনশন বা ব্যাংকের সুদ থেকে যা অর্থ আসে তা দিয়ে বেঁচে থাকা দুরূহ। এইখানে আগেকার দিনের তুলনায় একটা বড় পরিবর্তন এসেছে। যৌথ পরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সযত্নে এবং সসম্মানে থাকতে পারতেন– এখন তারা জনবলহীন। ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে– বিশেষ প্রয়োজনে হয়তো তারা কাছে এসে দাঁড়াবে– কিন্তু গোটা বছরের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় তাদের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। মধ্যবিত্ত অধিকাংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পক্ষে দীর্ঘজীবন সুখের জীবন নয়। তারা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ।

চার

এই টালমাটাল বিশ্বমন্দা পরিস্থিতি আর অসহনীয় দ্রব্যমূল্যের চাপে মধ্যবিত্ত কোন দিকে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া শক্ত। কিন্তু যেটুকু আভাস পাওয়া যায় তাতে আশান্বিত হবার কারণ দেখা যায় না। রাজনৈতিক স্তর উচ্চকণ্ঠে অনেক মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে এবং হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। 'পল্লীবন্ধু'-র রাজত্বে 'নতুন বাংলাদেশ', পরবর্তী সময়ে 'স্বপ্নের বাংলাদেশ', আরও পরে 'দিনবদলের পালা' থেকে একেবারে হালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর জিকির আমরা শুনছি। এমন কোনো যাদুদণ্ড আমাদের কর্মকর্তাদের হাতে নেই যাতে আগামীতে দারিদ্র ও বেকারত্ব সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সহনীয় পর্যায়ে থাকবে– সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের কর্মসংস্থানের সমস্যা স্থায়ীত্বের ভিত্তিতে থেকেই যাবে। বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে যে আর্থিক সংকট দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে তার নিরসন খুব শিগগীর হবে না। যে হারে আমাদের এখানে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে সে হার মোটামুটি অপরিবর্তনীয় থাকলে দশ বছর পরে মধ্যবিত্তের ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর বর্তমান স্তর থেকে অন্তত ১০০ শতাংশ বাড়বে।

অবশ্য আয়ও বাড়বে; কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে মোটেও তাল রেখে বাড়বে না। মূল্যস্ফীতির ফলে কারও কারও আয় বাড়ে আনুপাতিকের চেয়ে বেশি হারে (ব্যবাসায়ীদের), আর অন্যদের আয় বাড়ে ধীরগতিতে– সনাতন বাংলাদেশী শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে পড়ে। অবশ্য মধ্যবিত্তের বিত্তের বিচারে পরিসংখ্যানগত সংখ্যা অনুসারে এর গঠন ও কাঠামো আরও বদলাবে। বর্তমান প্রবন্ধে যাদের সনাতন মধ্যবিত্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তারা আরও নিচে নেমে আসবে। বিদেশে গিয়ে উপার্জনের সুবিধা সীমিত হবে আরও– প্রত্যেক দেশই এখন নিজেদের তরুণ কর্মপ্রার্থীদের সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ছে। দেশের মধ্যে সরকারি চাকরি বা বেসরকারি উদ্যোগে ভালো কাজ পাবে মোট কর্মপ্রার্থীর একটা ক্ষুদ্র অংশ।

যে শ্রেণীকে আমরা এখনও মধ্যবিত্ত বলি তাদের পরবর্তী প্রজন্মে অনেকের হয়তো খুব ভালো উপার্জন হবে। কিন্তু অনেকেরই জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে না, কারণ মূল্যবৃদ্ধি এবং ধনীজন অনুসরণকারী ভোগপ্রবণতার ফলে আয়-ব্যয়ে সমতা আসবে না। তবু যারা কাজ পাবে তাদের সমস্যা হবে সহজতর– যারা কাজ পাবে না কঠিন সমস্যা হবে তাদেরই। বস্তুত মধ্যবিত্তের মূল সমস্যা শিক্ষিত বেকারের সমস্যা। অতীত-বর্তমানের পরিসংখ্যান থেকে উপলব্ধ এই ভবিষ্যৎ-চিত্রনে অনেক ত্রুটি থাকতে পারে– তবু মোটামুটি চিত্রটা হবে এ-রকমেরই।

পশ্চিমা দেশগুলোতে বেকারের জীবনযাত্রার অন্তত ন্যূনতম মান রক্ষার ভার নেয় সরকার। সে অবস্থায় আমরা কোনো দিন পৌঁছব সে আশা করা অলীক কল্পনা মাত্র ভবিষ্যতে যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেঁচে থাকতে চায়– তাহলে তাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। তাদের হতে হবে নতুনতর জীবনদর্শনমুখী।

যতদিন আয়-বৈষম্য এবং সম্পদ-বৈষম্য সম্পূর্ণ দূরীভূত না হবে ততোদিন পরিসংখ্যানের দিক থেকে একটা মধ্যবিত্ত স্তর থাকবেই। অসাম্য যতই কমবে ততো-ই এই মাঝারি আয়স্তরের লোকের সংখ্যা বাড়বে। একেবারে হতদরিদ্র এবং বিরাট ধনী– এদের সংখ্যা কমে আসবে। অতএব সেদিক থেকে মধ্যবিত্ত স্তরেরই প্রসার ঘটবে, কিন্তু আমরা বহু বছর ধরে মধ্যবিত্ত বলতে যা বুঝে এসেছি তা সবদিক দিয়ে বদলে গিয়ে মধ্যবিত্ত এক নতুন অবয়ব পাবে।

শিক্ষার প্রসার হবে, শিক্ষিত মাঝারি আয়ের জনসংখ্যা বাড়বে, আবার তাদের মধ্যে বেকারত্ব বাড়বে। কিন্তু পেশাগত, আত্মাভিমানী যে মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্গত আমরা অনেকেই– সে সমাজ ক্রমে বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের দেশে এখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা হালের উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা যে ভাষা বা ইডিয়ম ব্যবহার করে, ডি-জুইস ঘরানার যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করে তার অর্থ তাদের বাবা-মা-রাও বুঝতে পারেন না। এই ছেলেমেয়েরা একদিন মা-বাবা হবে, তখন তারাও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভাষা-আচার-ব্যবহার শুনে-দেখে বিভ্রান্ত হবে আরও বেশি করে।

আয় মানদণ্ডে মধ্যস্তরে অবস্থান যার, শিক্ষায় উচ্চস্থিত, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত, নিজেদের দেশপ্রেম নিয়ে গঠিত যে শ্রেণীকে আমরা এতকাল দেখে এসেছি, সেটা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। একবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী দশকগুলোতে এই পথেই হবে আমাদের আরোহণ কিংবা অবতরণ। ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত সামনের সম্ভাব্য পরিণতির জন্য আমরা আশান্বিত বা আশাহত দুটোই সমানভাবে হতে পারি।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা: কার্যকারণ অনুসন্ধান

শা হ আ ল ম সা রো য়া র

যে কোনো পণ্যের মূল্য নির্ভর করে দুটো বিষয়ের ওপর। এর একটি হলো সাপ্লাই বা সরবরাহ অন্যটি হলো ডিমান্ড বা চাহিদা। সরবরাহ যদি বেড়ে যায় তাহলে পণ্যের মূল্য কমে যায়; সরবরাহ কমে গেলে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। আবার চাহিদা বেড়ে গেলে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে; চাহিদা কমে গেলে দামও কমে যাচ্ছে। কিন্তু এর সাথে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা যোগ থাকে। সেট হলো একজন ব্যবসায়ী যিনি ঐ পণ্য ব্যবসা করে বিক্রি করে থাকেন সেটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি তার কতটুকু থাকে তার ওপর কিন্তু ঐ পণ্যের মূল্য নির্ভর করে। এটা সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক বাজারে দিকে তাকালেই স্তি বোঝা যাবে। যেমন তেলের কথাই ধরা যাক,গত দেড় বছর আগে তেলের দাম যে পর্যায়ে গিয়ে ছিলো তখন মনে হয়েছিল সমগ্র পৃথিবীর তেল যেন শুকিয়ে গেছে। তখন অর্থনীতিবিদেরা দেখলেন যে সমগ্র পৃথিবীতে যে তেল সম্পদ ছিলো তা আসলে শেষ হয়ে গেছে বলেই তেলের দাম বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন দেখা গেলো পৃথিবীর সেরা সেরা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকগুলো কলাপস করছে– অর্থাৎ যারা তেল কম্পানিগুলোকে বা মধ্যস্থাতাকারী ব্যবসায়ীদের তেল হোল্ড করার জন্য ফাইনান্স করে যে ধন শক্তিটা দিয়ে ছিলো সেটা যখন কলাপস করে গেছে তখন দেখা গেলো তেলের দাম ওয়ান থার্ড হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তেলের মূল্য অর্ধেকে নেমে গেছে এবং

এটা অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। অর্থাৎ যে গমে টন সমগ্র পৃথিবীতে সাড়ে চারশ বা পাঁচশ ডলার ছিলো সে গমের দাম টন দেড়শ ডলারে নেমে এসেছে। সয়াবিনের মূল্য বারশ ডলার ছিলো সেটার মূল্য আড়াইশ ডলারে নেমে এসেছে। তেল শতশত আটশ ডলারে ছিলো সেটার মূল্য দশ-আড়াইশ ডলারে নেমে এসেছে। এতে একটা জিনিস এখন প্রমাণিত হচ্ছে সেটা হলো শুধুমাত্র সম্পদের স্বল্পতার জন্যই যে দাম বাড়ছে তা নয়; এই সম্পদকে মজুদ করে বিক্রি করার যে একটা অলিখিত নিয়ন্ত্রিত মার্কেট তৈরি হয়েছে সেটার মাধ্যমেও কিন্তু দ্রব্যমূল্য বাড়ছে এখন যদি আমাদের দেশে ট্রান্সলেট করে নিয়ে আসা যায় তাহলে এর কিছুটা সত্যতা দেখা যাবে। আমাদের দেশে হয়তো একটা দ্রব্য কম আমাদনি কম করা হচ্ছে এবং সে জন্য তার দাম বাড়াবার একটা সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু তার সাথে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা কাজ করছে সেটা হলো যারা ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা যোগাড় করে ঐ দ্রব্যটাকে একসঙ্গে অনেকবেশি পরিমাণ হোল্ড করে সেটাকে পরিমিত ভাবে বিক্রি করছেন; তার ওপর কিন্তু দ্রব্যমূল্যর বিষয়টা নির্ভর করছে। এর একটা স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায় যে সারা পৃথিবীতে পণ্যের দাম কমে প্রায় এক তৃতীয়াংশ হয়ে যাওয়াতেও যে তুলনায় বাংলাদেশে কিন্তু পণ্যের দাম কমেনি।
প্রসঙ্গ: নিরব দুর্ভিক্ষ হচ্ছে।

দুই

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বা দারিদ্রসীমার কাছাকাছি স্তরে বসবাস করছে। ভারত বা নেপালের কিছু কিছু জায়গা ছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা অনেক কম পূরণ করতে পারছে। উন্নত দেশে গেলে বোঝা যায় আমাদের দেশের মানুষ কতটা গরীব এবং অমানবিক জীবন যাপন করছে। এই ধারাটি একটি ক্রমাগত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা যে এক সরকারের আমলে শুরু হয়েছে আর অন্য সরকারের আমলে পরিবর্তিত হয়ে যাবে– বিষয়টি এমন নয়। এটা আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির অনেক দিনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তা যে কোনো উন্নত দেশের তুলনায় ভিন্ন। আমাদের দেশে এখনও যদি কোনো একটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু হয় সেটা অনেক সংখ্যক মানুষকে সংশ্লিষ্ট না করে এগুতে পারে না। পক্ষান্তরে যে সমস্ত দেশে হাই টেকনোলজি হয়ে গেছে, বা যে সমস্ত দেশে সিস্টেম প্রসেসগুলো অনেক বেশি উন্নত হয়ে গেছে, সেখানে কিন্তু অনেক সংখ্যক মানুষকে সংশ্লিষ্ট না করেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার বড় বড় করপোরেশনগুলো একসময় চিন্তা করলো যে তাদের 'কষ্ট অব ডেলিভারি অব দ্যা প্রডাক্টস' কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে; কারণ তাদের প্রফিট বাড়াতে হবে এবং তারা 'কষ্ট

অব ডেলিভারি অব দ্যা প্রডাক্টস' কমানোর জন্য এবং প্রফিট বাড়ানোর জন্য তাদের তাদের হিউম্যান এলিমেন্ট যে কাজগুলোতে বেশি যুক্ত সেগুলোকে তারা আউট সোর্স করে দিয়েছে ভারত বা অন্যান্য দেশগুলোতে। এতে তাদের নিজেদের দেশে একটা প্রফিট হয় অর্থাৎ তাদের দেশের এক ধরনের উন্নতি হয়। অথচ সে দেশের অধিকাংশ মানুষ কিন্তু এটাতে নিয়োজিত হয়নি। কিন্তু আমাদের নীতিনির্ধারকরা যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আছেন তারা যদি নূন্যতম একটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য কোনো-একটা উপায় বের করে দিয়ে আমাদের অধিকাংশ মানুষকে সংশ্লিষ্ট করেন তাহলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। হয়তো উন্নত দেশগুলোতে বিদ্যুৎ খাতে ইনভেস্ট করার আর তেমন প্রয়োজন নেই। একইভাবে সেসব দেশে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং স্কুল, কলেজ তৈরি করারও হয়তো তেমন প্রয়োজন নেই। অথচ আমাদের দেশে যদি এই সমস্ত খাতগুলোতে অর্থ ব্যয় করার জন্য একটা ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাহলে আমাদের দেশে এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে এবং এই ধরনের ইনভেস্টের সুফল সরাসরি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে চলে যাবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষি বা কৃষিনির্ভর কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, আমাদের ল্যান্ডের যে ওনারশিপ প্যাটার্ন বা ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন প্যাটার্ন আছে, তাকে যদি রিফর্ম করা যায় তাহলেও এমপ্লয়মেন্ট বাড়ানো সম্ভব।

তিন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঠিক না হলে কখনোই রাষ্ট্রের শক্ত কাঠামো তৈরি হবে না। সে কারণে রাষ্ট্রের নির্বাহী পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য কাঠামো প্রয়োজন যারা সত্যিকার অর্থেই শক্ত হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। পৃথিবী যেখানে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশও সেই লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্জন করবে এটা আমাদের আশাবাদ। তবে এটা নিশ্চয়ই এক বা দুই দিনে অর্জিত হয়ে যাবে এমন কোনো বিষয় নয়।

বর্তমান সময়ে নানাভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে যে, 'সিন্ডিকেট' বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কিন্তু নিন্ডিকেশন শব্দটির প্রকৃত যে অর্থ সেটা কিন্তু নেগেটিভ কোনো বিষয় নয়। এই শব্দটির সৃষ্টি কিন্তু পজেটিভ একটি লক্ষ্য থেকেই। অথচ সিন্ডিকেট শব্দটি নেগেটিভ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, কেননা এই প্রক্রিয়ায় কয়েকজন ব্যবসায়ী মিলে দল বা গ্রুপ তৈরি করে তারা তাদের ইচ্ছেমতো উৎপাদিত বা আমদানিকৃত পণ্যের মনগড়া দাম নির্ধারণ করে দেয়। ঋণের গ্রাহকগণ ঠিকমতো বিনিয়োগ করছে কি-না, ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ফেরত দিচ্ছে কি-না, এমনকি তাদের ব্যবসায় লাভ হচ্ছে না লোকসান হচ্ছে, লাভ হলে কতটা লাভ হচ্ছে, লোকসান হলে

সেটা রিকভার কীভাবে করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে যদি সঠিক এবং কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা থাকে তাহলে এই সিন্ডিকেশন অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ হিসেবেই কাজ করার কথা।

চার

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে আপদকালীন মজুদ সৃষ্টি করা হয় না। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, গমের ঋতুতে যদি সরকার প্রতি মণ গম দুইশত ডলার করে কিনে কেন্দ্রীয়ভাবে মজুদ করে রাখে তাহলে যে সময় এই গমের দাম বেড়ে যাবে তখন এটা মজুত থেকে বাজারে ছেড়ে দিলে দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কিন্তু যেহেতু সরকারি ক্ষেত্রে এ ধরনের দায়িত্ব নেয়া হচ্ছে না, শুধুমাত্র প্রাইভেট সেক্টর এর দায়িত্ব নিচ্ছে; এবং যেহেতু সকল প্রাইভেট সেক্টরেরই নীতিগত সর্বোচ্চ লাভ করার একটা মোটিভ থাকে সেহেতু সর্বোচ্চ লাভ তখনই সে করতে পারে যখন চড়া দামের লক্ষ্যে রেখে রেখে বিক্রি করার জন্য তার অতিরিক্ত টাকা থাকে। সে যদি ব্যাংক থেকে বা অন্য যে কোনো মাধ্যম থেকে টাকাটা জোগাড় করে মজুত ধরে রাখতে চায় তাহলে সে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদীভাবে মজুত রাখতে পারে। এখন এই 'মজুত প্রবণতাকে' হ্রাস করতে হলে প্রয়োজন অতিরিক্ত টাকার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ অতিরিক্ত টাকা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভোগ্যপণ্য মজুত করার প্রবণতাকেও হ্রাস করা সম্ভব হবে না। তবে এটা কিন্তু গায়ের জোরেও করা যাবে না। কেননা এখন যদি বল প্রয়োগ করে কারো মজুত কমিয়ে দেয়া হয় অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, কোনো ব্যবসায়ী উচ্চমূল্যে কিনে নিম্নমূল্যে পণ্য বেচবে– আর এটা গায়ের জোরে চাওয়া হলে ঐ ব্যবসায়ী ব্যাংক-দেউলিয়া হয়ে যাবে। এতে করে ঐ ব্যবসায়ী আর আমদানি করতে পারবে না। কাজেই এই মজুত প্রবণতা রোধ করার একমাত্র উপায় হল– ব্যবসার মূল টাকা যেখান থেকে আসে সেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে শৃঙ্খলা তৈরি করা এবং এই মজুতকে একটা ওয়ার্কিং লেবেলে নিয়ে আসা। সরকার বিকল্প ব্যবসায়ী দল তৈরি করেও এটা করতে পারে।

অন্যদিকে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো ব্যবসায়ীকে ইনডিভিজ্যুয়ালি অনেক টাকা দিয়ে দিচ্ছে আসলে তা নয়। আবার কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাংককে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মোটা অংকের টাকা নিয়ে যাচ্ছে তা-ও নয়। আসলে বাংলাদেশের সমগ্র আর্থিক প্যাকেজটা যেভাবে ম্যানেজড হচ্ছে– ঋণ দেয়া হল তারই একটি স্বাভাবিক পরিণতি। অনেক সময় দেখা যায় একজন ব্যক্তিকে ঋণ দেয়ার জন্য একইসাথে দশটি ব্যাংক ঘুরছে। ধরা যাক ব্যাংকের ঋণ যারা নিয়েছিল, তারা ঠিকভাবে সেই ঋণ পরিশোধ করেছে। সে কারণে ব্যাংক তাদের আর্থিক সহযোগিতা দিতে আগ্রহী হয়। এখন আমাদের দেশে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটির মতো ব্যাংক রয়েছে, এই ব্যাংকগুলো লেনদেনে স্বচ্ছ গ্রুপটাকেই অর্থ দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কাজেই এই গ্রুপটার কাছে

বড় অংকের টাকা চলে যাচ্ছে এবং তাদের বেশিদিন পণ্য মজুত রাখার ক্যাপাবিলিটিও বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই কোনো ব্যক্তিকে এককভাবে দোষারোপ না করে সমগ্র আর্থিক প্রক্রিয়াটা কীভাবে ম্যানেজড হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। এবং এই প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো পদক্ষেপগুলো ব্যাংক চাইলে গ্রহণ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল, এই প্রক্রিয়াটাকে রোধ করা যাবে কীভাবে? এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকরা যদি মনে করেন, কোনো আমদানির জন্য তারা তিন মাসের একটি লোন দেবেন, তাহলে ব্যবসায়ীদের একটি সময় তারা বেঁধে দেবেন যেন তিন মাসের ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া যাতে নয় মাসে গিয়ে বা এক বছরে গিয়ে না পৌঁছায়। এই তিন মাসের মধ্যেই যাতে ব্যাংক তার দেয়া ঋণ ফেরত আনতে পারে। এই সব বিষয়ে যদি ব্যাংকের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয় দেখা যাবে যে যারা তিন মাসের জন্য লোন নিয়েছে তারা লোনটাকে দু'বছর আটকে রাখতে পারবে না। ফলে পণ্য মজুত করে রাখার বিষয়টা একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ঐ ব্যবসায়ী বাজারে তার পণ্য ছেড়ে দিবে। এবং সেই পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়বে না।

পাঁচ

বিশ্বমন্দা বলতে যে বিষয়টিকে বোঝায়, সেটা হল, একটা সময়ে আন-এমপ্লয়মেন্ট বেড়ে যায়, আন-এমপ্লয়মেন্ট বেড়ে গেলে দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়, দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হয়ে যায়, ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হয়ে গেলে আবার আন-এমপ্লয়মেন্ট বেড়ে যায়– এরকম একটি সাইকেলকে বিশ্বমন্দা বলা হচ্ছে। এই মন্দা শুরু হয়েছিল একটা ছোট্ট জায়গা থেকে এখন সেটা একটা বড় আকার ধারণ করেছে। এটা হল যে কারণে সেটা হল, সারা পৃথিবীর ধনসম্পদ আমেরিকা-ইউরোপের কয়েকটা দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী আর্থিক ইনস্টিটিউশনগুলোতে গিয়ে জমা হয়েছে; তারা আবার সেই অর্থের ইন্টারেস্টকে বাড়ানোর জন্য লোন দিয়েছে। সেই ক্ষেত্রে কোনো কোনোটি ব্যাড-ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে। তখন একটা থেকে আরেকটা এফেকটেড হয়েছে।

ধরা যাক বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষেরই বাসস্থানের সমস্যা আছে কিন্তু তাদের তো বাড়ি কেনার মতো টাকা নেই। এই সমস্ত দেশে যদি কোনোমতে পুশ করে একটি ডিমান্ড তৈরি করা যায়, তাহলে হয়তো হাউজিং সেক্টরে ফাইন্যান্স বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু যে সব দেশে মানুষই বাড়ছে না, যে সমস্ত দেশে শুধু একটা ছোট্ট গ্রুপের আয় বেড়ে যাচ্ছে আরেকটা বড় গ্রুপের আয় মোটেও বাড়ছে না– ঐ সমস্ত দেশে হাউজিং ফাইন্যান্সকে পুশ করে বাড়ানোর চেষ্টা করা হলে দেখা যাবে একটা পর্যায়ে কিন্তু বাড়ি কেনার ঋণটা তারা হয়তো পরিশোধ করতে পারবে না। আমেরিকাতে এই মন্দা প্রথমে এরকম ছোট্ট একটি জায়গা থেকে শুরু হয়েছিল।

সেটা হল, একজন বাড়ির ক্রেতা সে ঋণ শোধ করতে পারবে কি-না, সেটা না দেখেই তাকে ঋণ দেয়া হয়েছিল; কারণ ঋণ দিলেই মুনাফা হবে, মুনাফা হলেই আরও মূলধন বাড়বে ইত্যাদি। বিশ্বের যে বড় বড় ব্যাংক-এর পাওয়ার হাউজগুলো বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এভাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিয়েছে। এর দ্বারা তারা পণ্যের একটা বৃহৎ মজুত তৈরি করে রেখেছিল। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সেই বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কলাপসড (বন্ধ) হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে তাদের ঋণও কলাপস করেছে। এই ঋণ কলাপস করার কারণে তারা তাদের পণ্যগুলো দ্রুত বিক্রি করার মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করছে।

আবার সেই ঋণের বড় একটা অংশ যখন অনাদায়ী হতে লাগল তখন ব্যাংকগুলো অনাদায়ী হিসেবে অন্যান্য ইনস্টিটিউশনের কাছে ঋণগুলোকেই আদায়ের শর্তে বিক্রি করে দিল। ইনস্টিটিউশনগুলো অনাদায়ের লক্ষ্যে ঋণগুলো কিনে নিল ঠিকই কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো সে সব ঋণ আদায় হল না। এতে করে ঐ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলো লোকসানের মধ্যে পড়ে বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে অনেক বছর ধরে বিশ্বে অর্থনৈতিক বুদ্বুদ তৈরি হয়েছিল বা অর্থনৈতিক একটি বেলুন ফুলেফেঁপে বিশাল আকার ধারণ করেছিল, সেই বেলুনটা হঠাৎ বার্স্ট হয়ে গেছে। এতে করে ঐ সব ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলো যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন তার প্রভাব অন্যান্য প্রকৃত আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর এসে পড়েছে। এতে হাউজিং সেক্টরের ওপরও প্রভাব পড়েছে– ফলে মানুষ সেখানে গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এতে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে যার প্রভাব সারা পৃথিবীর অর্থনীতির ওপর এসে পড়েছে। এভাবেই বিশ্বমন্দা একটা ছোট্ট জায়গা থেকে বড় আকার ধারণ করেছে।

বিশ্বমন্দার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে দুই ধরনের প্রভাব পড়তে পারে; তার মধ্যে একটা হল পজেটিভ; সেটা হল দ্রব্যমূল্যের হ্রাস। বিশ্বমন্দার কারণে আন-এমপ্লয়মেন্ট বেড়ে যাচ্ছে এবং সে কারণে দ্রব্যমূল্য কিন্তু কমে যাচ্ছে যার প্রভাব বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্যের ওপরও কিছুটা পড়তে শুরু করেছে। আরেকটা হল, আন-এমপ্লয়মেন্ট বেড়ে গেলে সেখানে আমাদের ম্যানপাওয়ার রপ্তানি এবং গার্মেন্টস-এর তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বিশ্বব্যাপী আন-এমপ্লয়মেন্টর কারণে উন্নত দেশের মানুষজনও কিন্তু দশটি শার্টের জায়গায় একটি বা দুটি শার্ট পরবে কিংবা যেখানে দশজন কর্মী কাজ করত সেখানে হয়তো দুই/তিন জন কর্মীকে কাজে রেখে অন্যদের অব্যাহতি দিয়ে দেবে।

আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর খুব উঁচুদরের পোশাক তৈরি করে না, যে কারণে উন্নত দেশের লোকজন হয়তো খুব উঁচুদরের পোশাক পরা থেকে বিরত থেকে একটু স্বল্পমূল্যের পোশাক পরা শুরু করতে পারে। যেমন ধরা যাক কেউ হয়তো বিলাসবহুল হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করত কিন্তু মন্দার কারণে হয়তো ফাস্টফুডের দোকানে খাবে– বিষয়টি অনেকটা এমন। কাজেই আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরের ওপর সে অর্থে বড় ধরনের বিরূপ প্রভাব আসবে বলে মনে হয় না। আরেকটা হল এখন পর্যন্ত আমাদের মতো সস্তায় দুনিয়াতে কেউ গার্মেন্টস সাপ্লাই করতে পারে না; সেদিক থেকে আমাদের শ্রমবাজার হারাবার সম্ভাবনাও কম। কাজেই আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরের ওপর সে অর্থে বড় ধরনের বিরূপ প্রভাব আসবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আমি মনে করি আতংকিত হওয়ার তেমন কিছু নেই।